রাজনর্ত্তকী

(শ্রীহর্ষের "নাগানন্দ" আংশিক অবলম্বনে)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্. এ.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্. সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
কলিকাতা-৬

মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর—শ্রীপরেশচন্দ্র মণ্ডল
বাণী বিচিত্রা প্রেস
৩১।১ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬,

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ২৩শে মে, ১৯৫৩।

সংগঠনকারীগণ—

স্বত্বাধিকারী	—	শ্রীসলিল কুমার মিত্র, বি. কম্।
পরিচালক	—	শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম. এ।
সুর-শিল্পী	—	শ্রীদুর্গা সেন।
নৃত্য-শিল্পী	—	শ্রীললিত কুমার।
দৃশ্য-শিল্পী	—	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক	—	শ্রীঅনিল বসু।
স্মারক	—	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (হাবুল বাবু) ও শ্রীমণি চাটার্জ্জি (এঃ)।
এম্প্লিফায়ার বাদক	—	শ্রীদুলাল মল্লিক।
যন্ত্রী-সঙ্ঘ	—	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুরারী রায় (এঃ), শ্রীমিহির মিত্র, শ্রীঅনিল বরণ রায়, শ্রীমাখন মুখোপাধ্যায়।
আলোক-নিয়ন্ত্রণকারীগণ	—	শ্রীবৃহস্পত রাম, শ্রীভানু মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথ সেন, শ্রীজলধর দাস, শ্রীমণীন্দ্র নাথ দে।

রূপ-সজ্জাকারীগণ — শ্রীসত্যেন সর্ব্বাধিকারী,
শ্রীবটকৃষ্ণ দে,
শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,
শ্রীফেলা রাম দাস,
শ্রীগদাধর দাস,
শ্রীবিজয় কুমার ঘোষ,
শেখ্ ফরহাদ্,
শেখ্ আবদুল রসিদ্।

দৃশ্য-সজ্জাকারীগণ — শ্রীভূষণ চন্দ্র সামন্ত,
শ্রীভরত মিস্ত্রি,
শ্রীযুগোল কিশোর গুঁইন,
শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র রায়,
শ্রীকাত্তিক কর্ম্মকার,
শ্রীনরেন কর্ম্মকার,
শ্রীরামদাস দাস,
শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী,
শ্রীশশীভূষণ .দাস,
শ্রীসন্তোষ সরকার,
শ্রীউপেন চক্রবর্ত্তী।

—উদ্বোধন রজনীর শিল্পীবৃন্দ—

বাসুকী ইন্দ্র	—	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত।
শঙ্খচূড়	—	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য।
জীমূতকেতু	—	শ্রীসন্তোষ দাস।
গরুড়	—	শ্রীসত্য পাঠক।
জীমূতবাহন	—	শ্রীচন্দ্র শেখর দে।
আত্রেয়	—	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য।
নাগাচার্য্য	—	শ্রীরাজ কুমার মল্লিক।
মিত্রাবসু	—	শ্রীঅজিত সোম।
শেখর	—	শ্রীশান্তি দাশ গুপ্ত।
সুনন্দ	—	শ্রীবলাই গরাই।
কালনাগ	—	শ্রীতারক ঘোষ।
কঞ্চুকী	—	শ্রীনলিন বাগ।
হোত্রবাহন	—	শ্রীবিজন্ ঘোষ।
নাগদূত	—	শ্রীভূপেন চৌধুরী।
নাগ প্রহরী	—	শ্রীপ্রণব সেন।
দেবগণ	—	শ্রীপবিত্র রায়, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর গুপ্ত, শ্রীনরেন দত্ত, শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রণব সেন।
বাসন্তিকা	—	শ্রীমতী রাণী বালা।
মলয়াবতী	—	শ্রীমতী ফিরোজা বালা।
দেবী	—	শ্রীমতী বন্দনা দেবী।
উর্ব্বশী	—	শ্রীমতী শেফালী দত্ত।

মেঘছন্দা	—	শ্রীমতী মেনকা দত্ত।
নবমালিকা	—	শ্রীমতী আঙুর বালা।
নাগকন্যাগণ সিদ্ধাঙ্গনাগণ সখীগণ	—	শ্রীমতী আঙুর বালা, শ্রীমতী সরসী, শ্রীসবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশারাণী দাসী, শ্রীমতী বকুল, শ্রীমতী বেলা সরকার, শ্রীমতী গৌরী মুখার্জ্জি, শ্রীমতী ঝর্ণারাণী চ্যাটার্জ্জি, শ্রীমতী ঊষা, শ্রীমতী সবিতা দে।

———

—চরিত্র পরিচয়—

—পুরুষ—

ইন্দ্র	...	...	দেবরাজ।
বাসুকী	....	....	নাগরাজ।
কালনাগ	...	....	ঐ সেনাপতি।
শঙ্খচূড়	...	...	ঐ সিন্ধু প্রতিহার।
নাগাচার্য্য	...	...	ঐ গুরুদেব।
জীমূতকেতু	...	...	বিদ্যাধর রাজ।
জীমূতবাহন	...	...	ঐ পুত্র।
আত্রেয়	...	...	ঐ বিদূষক।
গরুড়	...	...	বিনতানন্দন।
শেখর	...	...	জনৈক সিদ্ধ।
মিত্রাবসু	...	...	সিদ্ধ রাজকুমার।
হোত্রবাহন	...	...	তাপস।
সুনন্দ	...	...	জনৈক সিদ্ধ।

দেবগণ,

কঞ্চুকী, নাগ প্রহরী ও নাগদূত ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

উর্ব্বশী	....	...	স্বর্গরাজ নর্ত্তকী।
মেঘছন্দা	...	...	নাগরাজ নর্ত্তকী।
মলয়াবতী	...	....	সিদ্ধ রাজকন্যা।
বাসন্তিকা	....	...	ঐ সখী।
দেবী	...	....	জীমূতবাহনের মাতা
নবমালিকা	...	...	জনৈকা সিদ্ধাঙ্গনা।

প্রতিহারিণী,

নাগকন্যাগণ, সখীগণ ও সিদ্ধাঙ্গনাগণ ইত্যাদি।

রাজনর্ত্তকী

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(নাগলোক। নাগরাজ বাসুকীর প্রমোদগৃহ। কালনাগ উপবিষ্ট ও নাগকন্যাদের নৃত্যগীত।)

ফোঁস্—ফোঁস্—ফোঁস্—ফোঁ···স—ফোঁস,
সাপিনীর মন্তরে মন্তর ওঠ বেজে
নাগিনীরা তালে তালে সাবধান হোস্।
ফণার দোলনে জ্বালা—হাজারো মাণিক্
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।
চিকণ মরণ ওই ঝলকে ওঠে
লিক্—লিক্—লিক্—লিক্।
আয় নেচে সুন্দরী নৃত্যের ছন্দে
মাতোয়ারা আপনার নীল-বিষ গন্ধে
পাতাল মাতাল হোলো দোলন আনন্দে
চুপ চুপ বোস্ বোস্।

(গীত শেষে)

কালনাগ। বাঃ চমৎকার! অপূর্ব্ব!

(নেপথ্যে—জয় নাগলোকেশ্বর মহারাজ বাসুকীর জয়।)

(বাসুকীর প্রবেশ)

কালনাগ। সম্রাট জয়তু। নাগকন্যাগণ, সম্রাট বাসুকীকে নূতন নৃত্যছন্দে বন্দনা কর।

বাসুকী। না থাক্—আমি চাই না—চাই না শুনতে তোমাদের গান—চাই না দেখতে তোমাদের নৃত্য। যাও—তোমরা যাও—(নাগকন্যাদের প্রস্থান) কালনাগ—

কালনাগ। আদেশ করুন মহারাজ,—

বাসুকী। রাজনর্ত্তকী মেঘছন্দা কোথায় জান ?

কালনাগ। মেঘছন্দা '

বাসুকী। হ্যাঁ, সে না আসা পর্যন্ত প্রমোদগৃহে আমার সব উৎসব সমারোহ ম্লান—তার ললিত নৃত্য ব্যতীত সারা নাগরাজ্য যেন স্পন্দনহীন, নিষ্প্রাণ। কোথায় নৃত্য পটীয়সী মেঘছন্দা ? আমি চাই শুধু তারই নৃত্য দেখতে।

কালনাগ। মেঘছন্দাকে আমি সংবাদ পাঠিয়েছি সম্রাট। সিন্ধুতীর হ'তে শীঘ্রই সে নাগলোকে আসবে।

বাসুকী। সিন্ধুতীরে ! আজ হঠাৎ সে সিন্ধুতীরে গেল কেন ?

কালনাগ। শুধু আজই নয়। শুনলাম মেঘছন্দা আজকাল প্রায়ই প্রতি প্রভাতে, প্রতি সন্ধ্যায়, সিন্ধুতীরে বিচরণ করে।

বাসুকী। উদ্দেশ্য !

কালনাগ। জানি না সম্রাট।

বাসুকী। কে এ সংবাদ দিলে ? নিশ্চয়ই শঙ্খচূড় ?

কালনাগ। না সম্রাট। শঙ্খচূড় নয়, এ সংবাদ জানিয়েছে অনন্ত নাগ।

বাসুকী। অথচ এ সংবাদ, সবার আগে জানানো উচিৎ ছিল, ঐ শঙ্খচূড়ের। আমি তাকেই সিন্ধুকূলের প্রতিহার নিযুক্ত করেছি। তরঙ্গিত মহাসিন্ধু.. মর্ত্তলোক ও পাতালের সীমান্তরেখা। সেখানকার সমস্ত সংবাদ তার নখ-দর্পণে থাকবে, এই প্রত্যাশায়, শঙ্খচূড়কে সিন্ধু রক্ষী নিযুক্ত করলুম—আর সে কিনা—

(মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। সম্রাট্ জয়তু—

বাসুকী। এই যে রাজনর্ত্তকী মেঘছন্দা—

মেঘছন্দা। সম্রাট আমায় স্মরণ করেছেন ?

বাসুকী। হাঁ, রাজার প্রয়োজনে, রাজার প্রমোদগৃহে অপেক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য—একথা যখন তোমার স্মরণ থাকে না—তখন বাধ্য হয়ে, আমাকেই তোমায় স্মরণ করতে হল।

মেঘছন্দা। আদেশ করুন সম্রাট।

বাসুকী। আদেশ—হাঁ ভাল কথা, শুনলাম, তুমি আজকাল প্রায়ই সিন্ধুতীরে বিচরণ কর ?

মেঘছন্দা। হাঁ সম্রাট—

বাসুকী। কেন ?

মেঘছন্দা। সিন্ধুতীরে আমি যে এখন, নূতন ছন্দে নাচি।

বাসুকী। বটে—

মেঘছন্দা। সম্রাট—আমি যে নর্ত্তকী মেঘছন্দা। বর্ষার মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়—সমুদ্রের ঢেউগুলি দুলে দুলে ফুলে ফুলে ওঠে আমি মেঘের মাতন্ দেখি—ঢেউয়ের নাচন দেখি, সারা দেহ আমার আনন্দে বনকদম্বের মত রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কালো আকাশ, কালো সাগর, তার মাঝখানে জেগে ওঠে, এক শঙ্খ ধবল রূপকুমার।

বাসুকী। শঙ্খ ধবল রূপকুমার ! সে কে ?

মেঘছন্দা। জানিনা সম্রাট। সে যেন আলোর দূত। সে বুঝি আমারই মনের শতেক যুগের ব্যাকুল কামনা। আমি নাচি, উন্মদ আনন্দে নেচে উঠি। সে যে কি নৃত্য—সে

বে কি অপূর্ব্ব নৃত্য—আমি—আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না সম্রাট—

বাসুকী। বেশতো, বলতে না পার, নেচেই দেখাও। দেখি তোমার সেই নতুন নৃত্য ছন্দ।

মেঘছন্দা। কিন্তু সে তো এখন হবে না সম্রাট। আমি তো সে নাচ এখন নাচতে পারব না।

বাসুকী। কেন?

মেঘছন্দা। এখানে আকাশ ভরা মেঘ কই, সিন্ধুহিন্দোল কই? সেই নৃত্য জাগানো রূপকুমার কই?

বাসুকী। হুঁ—এ সব না হলে নাচ হবে না।

মেঘছন্দা। কেমন করে হবে?

বাসুকী। আমার আদেশেও না?

মেঘছন্দা। এতকাল তো আপনার আদেশে, বহুবার নেচেছি সম্রাট কিন্তু বলেছি তো—এ সে নাচ নয়।

বাসুকী। এ নূতন নাচ—না?

মেঘছন্দা। হাঁ—

বাসুকী। সে নাচ আমার সামনে এখনও নাচা চলে না?

মেঘছন্দা। না—

বাসুকী। উত্তম। আমার আদেশেও সে নূতন নাচ তুমি নাচতে পার রাজনর্ত্তকী, তাই আজ আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। কালনাগ—

কালনাগ। আদেশ করুন সম্রাট—

বাসুকী। এই দুর্ব্বিনীতা নাগিনীকে, হস্তপদে লৌহ শৃঙ্খল পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ কর। যাও নর্ত্তকী মেঘছন্দা—নিরন্ধ্র কারাগারের পাষাণ গহ্বরে একবিন্দু বারির জন্য, একবিন্দু

আলোর রশ্মির জন্য যখন আর্ত্তস্বরে আমার করুণা ভিক্ষা করবে, দেখো তখন কি অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে, তোমার সর্ব্বদেহের লৌহশৃঙ্খলগুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কালনাগ নিয়ে যাও—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। সম্রাট, সিন্ধু প্রতিহার শঙ্খচূড়!

মেঘছন্দা। শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়—

বাসুকী। পাঠিয়ে দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) শঙ্খচূড়ের নাম শুনে তুমি চমকে উঠলে যে?

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচূড়। সম্রাট! ভীষণ দুঃসংবাদ।

বাসুকী। দুঃসংবাদ! এর চেয়েও ভীষণ? (মেঘছন্দাকে দেখাইলেন)

শঙ্খচূড়। এ কি—রাজনর্ত্তকী! তুমি?

বাসুকী। উহুঁ....আর নর্ত্তকী নন্—উনি এখন বন্দিনী,—কালনাগ—নিয়ে যাও...

মেঘছন্দা। না না, আমি যাবনা। আমি নাচব—সেই নাচ নাচব—

বাসুকী। সে কি! ভয়ে?

মেঘছন্দা। না—আনন্দে!

বাসুকী। কিন্তু—এখানে তো আকাশ ভরা মেঘ নেই!

মেঘছন্দা। আকাশ ভরা মেঘের মতন এখন মেঘছন্দার দেহে—

বাসুকী। এখানে তরঙ্গিত মহাসিন্ধুও নেই?

মেঘছন্দা। সিন্ধুর হিন্দোল এই বুকে—

বাসুকী। আর রূপকুমার—?

মেঘছন্দা। রূপকুমার—রূপকুমারের রূপের আলো, আমার দু'টী নয়ন জুড়ে—

[মেঘছন্দার নৃত্য ও নৃত্য শেষে সে শঙ্খচূড়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল]

বাসুকী। (ক্রোধে আত্মহারা হইয়া) রাজনর্ত্তকী—রাজনর্ত্তকী!

(মেঘছন্দা আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

বাসুকী। শঙ্খচূড়, তুমি আমার প্রমোদগৃহে কোন সাহসে এসেছ ?

শঙ্খচূড়। সম্রাট বিস্মৃত হয়েছেন, আমি তাঁর অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি—

বাসুকী। ওঃ—অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু কেন—কেন এসেছ তুমি ?

শঙ্খচূড়। দুঃসংবাদ এনেছি সম্রাট!

বাসুকী। দুঃসংবাদ। রাজার আদেশে রাজনর্ত্তকী যখন নাচতে চায়নি, ভেবেছিলুম সেইটেই সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। কিন্তু যখন সে নাচল, সে দুঃসংবাদ হ'ল আরও মর্ম্মান্তিক।

শঙ্খচূড়। সম্রাট!

বাসুকী। স্তব্ধ হও। চাই না—চাই না শুনতে আমি আর কোন বার্ত্তা, কোন দুঃসংবাদ। কালনাগ, আমার আদেশ, এই মুহূর্ত্তে এদের দুজনকে বন্দী করে, মশানে নিয়ে যাও আমি দেখতে চাই ও স্বৈরিণী রাজনর্ত্তকীর ছিন্নশির—স্পর্দ্ধিত শঙ্খচূড়ের ছিন্ন মুণ্ড।

কালনাগ। সম্রাট—

বাসুকী। কোন কথা নয়—ছিন্নশির—ছিন্নশির—

(নাগাচার্য্যের প্রবেশ)

নাগাচার্য্য। অপেক্ষা—

বাসুকী। কে! একি! গুরুদেব নাগাচার্য্য। আপনি এ অসময়ে!

নাগাচার্য্য। সুমেরু শিখরে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম। সহসা আমার অন্তর লোক হতে, কে যেন বলে উঠলো, নাগরাজ্যের মহা অকল্যাণ উপস্থিত। ধ্যানাসন ত্যাগ করে তাই ছুটে

এলুম এই পাতালপুরে···এই নাগরাজ্যে ! মোহান্ধ নাগরাজ, তুমি একি করেছ ! মেঘছন্দা ও শঙ্খচূড়ের প্রাণবধ করবার দুর্ব্বুদ্ধি, তোমায় কে দিল বাসুকী ?

বাসুকী। প্রভু, আপনি জানেন না এদের গুরু অপরাধ—

নাগাচায্য। আমি সব জানি বাসুকী। তুমিই বরং জেনে রাখ, নাগলোকে এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয় সমাগত, হয়তো সে বিপয্যয়ে, নাগকুল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ! সেই চরম দুদ্দিনে, নাগকুলকে রক্ষা করবে, এই নর্ত্তকী মেঘছন্দা, আর তার উপলক্ষ্য হবে এই শঙ্খচূড়।

বাসুকী। সে কি প্রভু—

নাগাচার্য্য। এদিকে এসতো মা,—(মেঘছন্দা কাছে আসিল) এই যে ললাট পটে মহাকালের সুস্পষ্ট লিখন—নাগবংশ রক্ষা-কারিণী—এই রাজনর্ত্তকী, যোগসিদ্ধ নাগাচার্য্যের দৃষ্টি-বিভ্রম হয় না। চল মা, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমায় সিদ্ধ-বিজয়িনী মন্ত্র দান করবো।

মেঘছন্দা। সিদ্ধ বিজয়িনী মন্ত্র।

নাগাচার্য্য। হাঁ, এই মন্ত্র লাভ করলে, যে কোন সিদ্ধ কিম্বা সিদ্ধাঙ্গনাকে, তুমি মুহুর্ত্ত মধ্যে সম্মোহিত করতে পারবে। কায়মনো-বাক্যে সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে।

মেঘছন্দা। কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে প্রভু ?

নাগাচার্য্য। শোন, সিদ্ধ রাজকন্যা মলয়াবতীর কাছে, এমন একটী নৃত্যবিদ্যা আছে, যা বিশ্বজগতের কোন নর্ত্তক নর্ত্তকী, এমন কি স্বয়ং উর্ব্বশীও কল্পনা করতে পারে না। তুমি সিদ্ধ রাজকুমারী, মলয়াবতীকে সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে তার নিকট হতে সেই পরমাশ্চর্য্য নৃত্যবিদ্যা লাভ করবে।

সেই বিদ্যার প্রভাবেই একদিন তুমি নাগকুলকে মৃত্যুর দেশ হতে জয় করে নিয়ে আসবে।

মেঘছন্দা। সে কি প্রভু, নৃত্য দিয়ে মৃত্যু জয় ?

নাগাচার্য্য। হাঁ বৎসে,—নৃত্য দিয়ে মৃত্যু জয়। চলো আমার সঙ্গে, আগে সিদ্ধ-বিজয়িনী মন্ত্র গ্রহণ করবে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

বাসুকী। নাগাচার্য্য এসব কি বলে গেলেন! এ যে প্রহেলিকার মত মনে হচ্ছে। (নেপথ্যে কোলাহল) এ্যাঁক—কোলাহল কিসের ? নাগকুল আর্ত্তনাদ করে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হচ্ছে।

শঙ্খচূড়। বুঝেছি— যা আশঙ্কা কচ্ছিলুম, তাই হল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

বাসুকী। কি সংবাদ ?

প্রহরী। সম্রাট, নাগকুলের মহাশত্রু সেই গরুড়, সিন্ধুকূলে গর্জ্জন করছে।

বাসুকী। গরুড়! নাগের জন্ম শত্রু সেই বিনতানন্দন গরুড়! শঙ্খচূড়, তুমি না সিন্ধুকূলের নাগ প্রতিহার! এ সংবাদ—

শঙ্খচূড়। মার্জ্জনা করবেন সম্রাট। গরুড়ের আগমন সংবাদ নিয়েই, আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছিলুম। কিন্তু বলবার সুযোগ পাইনি—

বাসুকী। তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আমার বক্তব্য তাকে জানিয়েছ ?

শঙ্খচূড়। জানিয়েছি সম্রাট। গরুড় উত্তর দিল—নাগকুলের সঙ্গে আমার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। দেহধারণ করবার জন্য, আমাকে নাগমাংস ভোজন করতে হবেই—

বাসুকী। হুঁ—নাগের মাংস তার আহার্য্য। সে নাগ হত্যা করবেই। কিন্তু তা বলে সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন সে

সিন্ধুজলে ঝাঁপ দেবে! পাহাড় প্রমাণ ডানার ঝাপটে, সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে, হাজার হাজার নাগের প্রাণ বিনষ্ট করবে?

শঙ্খচূড়। সে প্রশ্নও আমি বিনতানন্দনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

বাসুকী। কি উত্তর দিল?

শঙ্খচূড়। সে বলল, আমায় দেখে আতঙ্কিত নাগগণ চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে—আমিও তাদের ধরবার জন্য প্রলঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করি—তাইতো এত নাগ হত্যা হয়। নাগরাজ বাসুকী যদি প্রত্যহ আমার ভোজনের জন্য একটী করে নাগ প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হন—তাহলে আমাকে আর অনর্থক এত নাগ হত্যা করতে হয় না।

বাসুকী। গরুড় ঐ কথা বললে? প্রত্যহ আহার্য্যরূপে যদি একটী নাগ প্রেরণ করি—তবে সে আর নাগলোক আক্রমণ করবে না? একটী করে নাগ পেলে, সে সন্ধি করতে প্রস্তুত?

শঙ্খচূড়। হাঁ সম্রাট। আপনার উত্তরের অপেক্ষায়, অধীর চঞ্চলভাবে সে সিন্ধুতীরে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণ আপনার উত্তর নিয়ে, আমি তার কাছে যাইনি—তাই হয়তো তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। তারই জন্যে নাগকুল আতঙ্কিত।

বাসুকী। উত্তম। তুমি যাও শঙ্খচূড়, বিনতানন্দন সেই গরুড়কে জানিয়ে দাওগে, তার প্রস্তাবে আমি সম্মত। প্রত্যহ একটী করে নাগ, আমি তার নিকট প্রেরণ করব। সমগ্র নাগকুলকে সে যেন আর অনর্থক বিপর্য্যস্ত না করে।

শঙ্খচূড়। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—মলয় পর্ব্বত

(আত্রেয় ও জীমূতবাহনের প্রবেশ)

আত্রেয়। দেখ সখা, তুমি আমার একটা কথা শোন।

জীমূতবাহন। তোমার কোন কথাটা আমি না শুনি সখা আত্রেয় ?

আত্রেয়। শুনছ বটে, কিন্তু সব সময় তো কথা মত কাজ কর না।

জীমূতবাহন। করছি না ?

আত্রেয়। কই করছ ? তুমি বিদ্যাধর রাজপুত্র, জীমূতবাহন। তোমার পিতা মহারাজ জীমূতকেতু বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই বিদ্যাধর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে, তিনি সস্ত্রীক বনবাসী হয়েছেন। যেহেতু পিতা বনবাসী, তুমিও বনবাস ব্রত গ্রহণ করলে। বলি—বহু দিন তো পিতামাতার সেবা করলে, আর কেন ? এইবার রাজ্যে ফিরে চল, রাজ্য পালন কর।

জীমূতবাহন। রাজ্য পালনের তো কোনত্রুটী হচ্ছেনা সখা। অমাত্যগণের ওপর আমি আমার প্রজাদের সুখ দুঃখের সমস্ত ভার দিয়ে এসেছি। আমি জানি তাঁরা বিদ্যাধর রাজ্যের সুপরিচালনাই করছেন।

আত্রেয়। হুঁ—সুপরিচালনা কর্চ্ছেন বটে। কিন্তু তোমার জ্ঞাতি-শত্রু সেই পরাক্রান্ত মতঙ্গের কথা ভুলো না। সে সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজছে, কেমন করে বিদ্যাধর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করা যায়।

জীমূতবাহন। মতঙ্গ যদি আমার রাজ্য গ্রহণ করে, আমি তাতে এতটুকু দুঃখিত হব না সখা, বরং সুখীই হব।

আত্রেয়। সুখী হবে ?

জীমূতবাহন। হাঁ, রাজ্যতো তুচ্ছ কথা, জগতের যে কোন একটী প্রাণীর সুখের জন্য, আমি আমার এ শরীর হতে আরম্ভ করে, সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে পারি।

আত্রেয়। সখা,....

জীমূতবাহন। ও সব কথা থাক আত্রেয়। পিতার আদেশে, মধুময়ী প্রকৃতির লীলাভূমি এই মলয় পর্ব্বতে এসেছি। পিতার ইচ্ছা, এইখানেই একটী আশ্রম যোগ্যস্থান নির্ব্বাচন করে.. কুটীর নির্ম্মাণ করি।

আত্রেয়। স্থান আর নির্ব্বাচন করতে হবে কেন সখা? এই মলয় পর্ব্বতের সব স্থানই তো মনোরম!

জীমূতবাহন। সত্য বলেছ সখা, ঘন চন্দন বনে, পর্ব্বত ভূমি সুশোভিত। ঐ দেখ, দিকহস্তিদের গণ্ড ঘর্ষণে, ভগ্ন তরুশাখা হতে,. চন্দন নির্য্যাস বইছে। সুমধুর মলয় পবন চন্দনের সুমিষ্ট গন্ধে ভরপুর।

আত্রেয়। দেখ, দেখ সখা, ঐ মুক্তাময়ী শিলাভূমিতে রক্তের আল-পনার মত ও কিসের চিহ্ন?

জীমূতবাহন। সিদ্ধাঙ্গনাগণ ঐ পথে যাতায়াত করেন—ও তাঁদেরই চরণ অলক্তকের রক্তরাগ লেখা।

আত্রেয়। ঐ বুঝি তরুছায়ায় একটী তপোবন। হাঁ তপোবনই বটে। হবীগন্ধবাহী ধূম্রপুঞ্জ, আকাশ পানে উত্থিত হচ্ছে। মৃগশিশুরা কেমন নির্ভয়ে বিচরণ করছে। ঋষিকুমারদের ছিন্ন মৌঞ্জমেখলা ইতঃস্তত পড়ে আছে। দেখছ সখা—

জীমূতবাহন। হাঁ, দেখছি—

আত্রেয়। সখা, সরে এসো—সরে এসো। মাথায় কি যেন ঝুপ করে পড়লো। অ্যাঁ, এযে ফুল! পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে! আকাশের

দেবতারা নিশ্চয়ই তোমার উদ্দেশ্যে এই পুষ্পবৃষ্টি করছেন। তোমার কোন দেব কুমারী লাভ হবে।

জীমূতবাহন। না সখা, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেননি। আশ্রম তরুদল পুষ্প পরাগ ঝরিয়ে, আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ঋষিদের সাহচর্য্যে তপোবনের তরুশাখাও কী সুন্দর অতিথি সৎকার ধর্ম্ম শিক্ষা করেছে দেখ।

আত্রেয়। সখা, ঐ—ঐ শোন— (নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

জীমূতবাহন। একি বীণাধ্বনি ! বনমধ্যে এমন চমৎকার বীণা বাজায় কে ?

আত্রেয়। দেখ—দেখ সখা,—

জীমূতবাহন। কি—

আত্রেয়। দেখছ না—গৌরী-মন্দির।

জীমূতবাহন। হাঁ-তাইতো—ভগবতী গৌরীর মন্দির। মন্দির সোপানে বসে কে—কে ও অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রমণী বীণা বাদন করছে! একি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! না-না-ছি-ছি এ আমি কি করছি! উনি যদি পরস্ত্রী হন! পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনা যে মহাপাপ—

আত্রেয়। না সখা, সে ভয় নেই। ভাল করে তাকিয়ে দেখ, উনি পরস্ত্রী নন। মাথায় দেখছো না কোন অবগুণ্ঠন নেই, ললাটে চন্দনের পত্রলেখা মধ্যে সিন্দুর চিহ্ন নেই। উনি নিশ্চয়ই কোন কুমারী।

জীমূতবাহন। কুমারী ! হাঁ, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ সখা। ঐ যে, উনি ভগবতী গৌরীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন, সখী সঙ্গে মন্দির সোপান হতে অবতরণ করছেন। বীণা যন্ত্রটী মন্দিরেই রেখে এলেন। এ হতে অনুমান হচ্ছে উনি প্রত্যহই বীণা বাজিয়ে, ভগবতী গৌরীকে প্রসন্না

করতে আসেন। কিন্তু ব্রতচারিণী কুমারীর, কিসের নিমিত্ত এই গৌরী পূজা?

আত্রেয়। তা আর বুঝতে পারা এমন শক্ত কি সখা? কুমারীরা সাধারণতঃ, কুমারদের ব্রত ভঙ্গ করবার জন্যই, ব্রতচারিণী হয়ে থাকেন। এখন এই দেব সেনাপতি, কাত্তিকেয় তুল্য কুমারটীকে সামনে পেলেই, কুমারীর ব্রত পূর্ণ হয়।

জীমূতবাহন। আঃ—একি পরিহাস করছ সখা, ওরা এই দিকেই এগিয়ে আসছেন। হয়তো শুনতে পাবেন!

আত্রেয়। সত্যি কথা বললুম তাতেও রাগ! বিশ্বাস না হয় এসো, আমরা এগিয়ে গিয়ে কুমারীকেই জিজ্ঞাসা করি।

জীমূতবাহন। না, না সখা, তা কি কখনও হয়! ওঁরা এসে পড়েছেন! এসো, আমরা অন্তরালে অবস্থান করি।

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থান, অন্যদিক হইতে মলয়াবতী ও বাসন্তিকার প্রবেশ।)

বাসন্তিকার গীত—

সে কথাটি বলো বলো মৃদু মৃদু গুঞ্জরি'
মুকুলিত-যৌবনা ওগো সখি সুন্দরী।
কোন মধুকর দরশন পরশন বাসনা
আকুল করে তব তনুদেহ-মঞ্জরী!
সে কথাটি বলো বলো মৃদু মৃদু গুঞ্জরি'।
লাজ বিজড়িত শঙ্কিত নয়নে
স্বপ্ন পশারিনী জাগো ফুল শয়নে,
গন্ধ নিবেদন অধীর কম্পন
আনন্দে ওঠে একি মুঞ্জরি।

(গীত শেষে)

বাসন্তিকা। কি সখী, অমন চুপ করে কেন? এই বেলা বলনা, জীবন দেবতাকে বশ করবার কি ব্যবস্থা করছ?

মলয়াবতী। জীবন দেবতা!

বাসন্তিকা। হাঁ গো। আকাশ থেকে পড়লে যে' মনোমত পতি লাভের আশায়, রোজই তো ভগবতী গৌরীর মন্দিরে বীণা বাজাও। আঙ্গুল গুলোই ব্যথা হোল, দেবতা এলো না।

মলয়াবতী। দূর—ভগবতী গৌরীর কাছে, বীণা বাজালে বুঝি আঙুল ব্যথা হয়?

বাসন্তিকা। হয় না?

মলয়াবতী। না রে—আমার বীণা বাজানো শিক্ষা হয়েছে সার্থক।

বাসন্তিকা। কি করে শুনি?

মলয়াবতী। দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হয়েছেন।

বাসন্তিকা। সত্যি? কি হয়েছে, আমায় লুকোস্ না সই।

মলয়াবতী। আজ বীণা বাজাতে বাজাতে, যখন তন্ময় হয়ে গেছি, দেখলুম, ভগবতী গৌরীর বিগ্রহ যেন সজীব হয়ে উঠেছে। দেবী সুমধুর হাস্যে আমায় বললেন—তোমার বীণা বাদনে আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি। আমি তোমায় বর দিলুম—বিদ্যাধর রাজ চক্রবর্ত্তী অচিরে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।

বাসন্তিকা। বিদ্যাধর রাজচক্রবর্ত্তী! এতক্ষণ বলনি একথা! সখি, আজ তোমার সুপ্রভাত। আজ তোমার জীবনের পরম লগ্ন উপস্থিত হল।

(আত্রেয় ও জীমূতবাহনের প্রবেশ)

আত্রেয়। সখা, সব শুনলে তো? আর কেন? পরম লগ্ন বয়ে গেল, শীঘ্র এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দাও।

জীমূতবাহন। আমি পারব না সখা—

আত্রেয়। ঐ লজ্জাতেই তুমি গেলে! আচ্ছা, আমি বলছি। সত্য বলেছ সুন্দরী, আজ তোমার সখীর জীবনের সুপ্রভাত।

মলয়াবতী। ওমা! এঁরা কারা—ইনি কে?

বাসন্তিকা। সখি, এই বোধ হয়, তোমার গৌরী দেবীর দেওয়া, সেই বর—আহা, এত রূপ তো কখনও চোখে দেখিনি—

মলয়াবতী। (আত্মসম্বরণ করিয়া সলজ্জ ভাবে) সখি, এখানে আর থাকতে পারছি না। চল—আমরা যাই।

আত্রেয়। চলে যাবেন—সে কি রকম কথা? আমরা আপনাদের তপোবনে অতিথি। একবার বাক্য সম্ভাষণ না করেই পালিয়ে যাবেন?

বাসন্তিকা। সত্যিই তো সখী। অতিথিকে কি অবজ্ঞা করতে আছে? এমন সজ্জন অতিথি এসেছেন, আর তুমি কি না তাঁকে দেখে, বোকার মত কি করবে ভেবে পাচ্ছ না! কথা বল—

মলয়াবতী। না সখি—আমি ওকে কিছু বলতে পারব না।

বাসন্তিকা। বেশ, তোমার মুখে কথা না জোগায়, তোমার হয়ে আমিই আতিথ্য ধর্ম্ম পালন কচ্ছি। মহাশয়গণ, আপনারা ঐ শিলা বেদিতলে উপবেশন করবেন চলুন, উপবেশন করে স্থানটীকে অলঙ্কৃত করবেন।

আত্রেয়। সখা, এবার ইনি বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন তো? চল, বসা যাক্।

মলয়াবতী। সখি, একি করলে! এঁদের বসতে বললে—এখনতো এদের ত্যাগ করে এ স্থান হতে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ কোন তাপস এসে যদি দেখেন, আমাদের আচরণকে অশিষ্ট মনে করবেন।

বাসন্তিকা। ঐ যা—তাপসের নাম করতে না করতেই, যে একজন তাপস এসে উপস্থিত—

মলয়াবতী। তাপস!

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

জীমূতবাহন। প্রভু, আমি বিদ্যাধর জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি।

হোত্রবাহন। কল্যাণ হোক।

মলয়াবতী। (প্রণাম করিল)

হোত্রবাহন। বৎসে, আশীর্ব্বাদ করি, মনোমত পতি লাভ কর। শোন বৎসে, তোমার জনক জননী সকলেই, কুলপতি বিশ্বমিত্রের আশ্রমে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বিশ্বামিত্র আমাকে বলে পাঠালেন, মধ্যাহ্ন স্নানের সময় অতীত হয়েছে, সুতরাং, তুমি আমার সঙ্গে আশ্রমে প্রত্যাগমন কর।

মলয়াবতী। অগ্রসর হন প্রভু, আমি আপনার অনুবর্ত্তিনী হচ্ছি। চল সখী।

(মলয়াবতী ও বাসন্তিকাকে লইয়া তাপসের প্রস্থান)

আত্রেয়। চল সখা, আমরাও যাই। আর ওদিক পানে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কি হবে সখা? দ্রষ্টব্য বস্তু যা ছিল সে তো উধাও হয়ে গেল। সামনে এখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-প্রজ্জ্বলিত মরুভূমি তুল্য খোলা আকাশ; ওদিকে তাকিয়ে এখন শুধু উদরের অগ্নিতাপই দ্বিগুণ হবে। বরং এসো—উদর দেবতাকে সুস্থির করবার চেষ্টা করিগে।

জীমূতবাহন। চল—।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—লতা-বিতান

(বাসন্তিকার গীত)

দিন চলে যায়, গগন সীমায়, জাগিল সন্ধ্যা তারা।
কালিন্দীকূলে, বংশী ফুকারে, শ্রীমতী পাগল পারা॥
মেঘনীল শাড়ী পরি তাড়াতাড়ি, বাহিরিল কোন মতে।
মুখর মঞ্জীর, করে—কলরব, খুলে ফেলে দিল পথে॥
রাত্রি ঘনাল—ঘনাল আঁধার, নিরন্ধ্র যেন মরণ পাথার,
ঘন বনমাঝে যাবে কোনভিতে
অভিসারে পথ হারা—।
গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ গুঞ্জরি ভ্রমর, কহে তার কানে কানে
শ্যামচাঁদ দেহ, পরিমল লোভে, আমি যাই সেই পথে
ভোমরার পথে চলিতে চলিতে হেরিল ময়ূরী নাচে
তখনি বুঝিল নবজলধর আছে তার কাছে কাছে
দরশন লভি যতো হাসে রাই—
দুনয়নে বহে ধারা॥

(গীত শেষে মলয়াবতীর প্রবেশ)

বাসন্তিকা। একি সখি, বললে গৌরী মন্দিরে যাবে, কিন্তু এলে যে লতানিকুঞ্জে—

মলয়াবতী। তাই তো, আনমনে লতানিকুঞ্জে চলে এসেছি। হাঁরে সে কোথায়?

বাসন্তিকা। কে? কার কথা বলছ?

মলয়াবতী। সেই যে নতুন মেয়েটী?

বাসন্তিকা। ওঃ—মেঘছন্দা।

মলয়াবতী। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য মেয়ে, দু'দিন হোল আমাদের এখানে এসেছে,

আমাকে যেন ও বশ করে ফেলেছে। এক মুহূর্ত্ত ওকে ছাড়া থাকতে পারি না।

বাসন্তিকা। শুধু তুমিই নয় রাজকন্যা, এই মলয় পর্ব্বতের, সমস্ত সিদ্ধাঙ্গনার ও যেন চোখের মণি। হাসিতে, গল্পে, নাচে ও যেন সব'ইকে যাদু করেছে। মেঘছন্দা যেন এক মোহিনী—যাদুকরী।

(মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। ঠিক বলেছ, আমি যাদুকরী। যাদু বিদ্যা জানি।

মলয়াবতী। এসো—সই মেঘছন্দা—

মেঘছন্দা। তুমি দাঁড়িয়ে কেন সখী, এসো এই চন্দ্রমণি শিলাতলে একটু বিশ্রাম কর। বলতো, তোমার দেহের উত্তাপ একটু কমলো?

মলয়াবতী। না সখী, নিবিড় শাখা পল্লবে আচ্ছাদিত, এই চন্দন তরুকুঞ্জ, এখানে এসেও তো আমার তপ্ত দেহজ্বালা জুড়োচ্ছে না।

মেঘছন্দা। তাহলে একটু চুপ করে বোস। আমি তোমায় নাচ দেখাই।

মলয়াবতী। নাচ?—

মেঘছন্দা। হ্যাঁ, আমি যে যাদুমন্ত্র জানি। বিশ্ব প্রকৃতির বুকে প্রতি নিয়ত যে নাচের ছন্দ চলছে, সেই নাচ উপভোগ কর সখী।

(ফুল, প্রজাপতি, মেঘ ও ময়ূরের নৃত্য শেষে)

মলয়াবতী। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব এ নৃত্য।

মেঘছন্দা। খুশী হয়েছ—

মলয়াবতী। হ্যাঁ, খুশী হয়েছি—খুব আনন্দ পেয়েছি, এমন নাচ আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

মেঘছন্দা। কিন্তু এর চেয়েও সুন্দর নাচ তুমি জান।

মলয়াবতী। আমি—না—না—কে বললে ? –

মেঘছন্দা। বলেছেন—আমাদের গুরুদেব নাগাচার্য্য।

মলয়াবতী। নাগাচার্য্য—

মেঘছন্দা। হ্যাঁ, শুনেছি এমন একটী নৃত্য বল্লা তোমার আয়ত্বে আছে, যা নাকি স্বয়ং স্বর্গনর্ত্তকী উর্ব্বশীও জানেন না?

বাসন্তিকা। ওঃ—আমি বুঝেছি। তোমার বিদ্যুৎলাস্য।

মেঘছন্দা। বিদ্যুৎলাস্য। একটীবার—একটীবার আমায় দেখাবে সখী ?

মলয়াবতী। কিন্তু সে নাচতো নাচতে নেই। সে শুধু আয়ত্ব করা বিদ্যা—কিন্তু তাকে প্রয়োগ করতে নেই।

মেঘছন্দা। কেন সখী, প্রয়োগ করলে কি হবে ?

মলয়াবতী। সেই নাচের ছন্দে সর্ব্বাঙ্গে তার বিদ্যুৎশিখা খেলে যাবে। সেই বিদ্যুতের জ্বালায় নর্ত্তকীর হবে মৃত্যু—

মেঘছন্দা। মৃত্যু—

বাসন্তিকা। শুনেছি, সে নাচের পর আর কোন নাচ নেই, সেই জীবন-ছন্দের পর, অসীম অতল মরণ পাথার।

মেঘছন্দা। হোক্—তবু সে নাচ আমি আয়ত্ব করব। তোমায় নাচতে হবে না, তুমি ভূর্জ্জপাতায় সেই নাচের প্রণালী আমাকে লিখে দেবে। আমি লিখে নিয়ে সবার আগে প্রয়োগ করব, সেই মৃত্যুকাপর্ণা বিদ্যুৎলাস্য নৃত্য।

মলয়াবতী। সে কি সখী, না—না—তুই নাচবি না—নাচতে পারবিনা।...

মেঘছন্দা। হয়তো আমায় একদিন নাচতে হবেই ঐ বিদ্যুৎলাস্য, আমার দেশের জন্য, আমার জাতির জন্য, মৃত্যুর কবল হতে সমস্ত নাগকুলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। এযে আমার গুরুর আদেশ—

মলয়াবতী। গুরুর আদেশ। কিন্তু—

মেঘছন্দা। কোন কথা নয় সখী—আমার অভিশপ্ত জাতিকে, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য, আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা, দাও—দাও বিদ্যুৎলাস্য।

মলয়াবতী। বেশ, তাই হবে সখি। তবে তুই যা, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ভগবান রঙ্গনাথের মন্দিরে পূজা দিয়ে, তাঁর আশীর্ব্বাদি বিল্ব দল নিয়ে আয়। আজ রাত্রি তৃতীয় যামে, সমস্ত জগৎ যখন নিদ্রামগ্ন থাকবে, আমি তোকে সে বিদ্যা দান করব।

মেঘছন্দা। স্বীকৃত হলে। আমি আজ ধন্য। আমার জীবন আজ সার্থক।

(মেঘছন্দার গীত)

আজ আলো ঝলমল, সোনালী প্রভাত
দেখা দিল মোর জীবনে।
আশার বাণী বয়ে আনে আজ
চকিত বিহগ কূজনে॥
গগনে ঝরে আনন্দ, ভুবনে গীতি ছন্দ
নন্দন মধু গন্ধ, বহিছে মলয় পবনে॥

(গীত শেষে)

মেঘছন্দা। আমি যাই, রঙ্গনাথের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

বাসন্তিকা। সখি, সত্যই তুমি ওকে, বিদ্যুৎলাস্য নাচের প্রক্রিয়া শিখে দেবে?

মলয়াবতী। হঁ:—

বাসন্তিকা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কখনোতো কাউকে দাও নি?

মলয়াবতী। আজ পর্য্যন্ত কেউ যে অমন আকুল হয়ে তার মুমূর্ষ জাতির জীবন বাঁচাবার জন্য ও বিদ্যা চায়নি। আর তাছাড়া,

মেঘছন্দার কোন প্রার্থনায় আমি যে "না" বলতে পারি না। কী মোহিনী শক্তির বলে ও আমাকে জয় করেছে, ওই জানে।

বাসন্তিকা। ও তোমাকে সত্যিই খুব ভালবাসে। তোমার উপকারের জন্য ওর চিন্তার অবধি নেই। বিদ্যাধর কুমার জীমূতবাহনের সম্বন্ধে ও আমাকে আজ কি বলেছে জানো।

মলয়াবতী। কি, কি বলেছে তার সম্বন্ধে ?

বাসন্তিকা। বললে, নাগিনী আমরা, কত মন্ত্র তন্ত্র জানি, বহুরূপীর মত কত মূর্ত্তি ধরি। আজ স্বপ্ন পরী হয়ে, ঘুমন্ত নদীর সেতু পার হয়ে, আমি সেই বিদ্যাধর কুমারের কাছে গিয়েছিলাম।

মলয়াবতী। সত্যি—তারপর—তারপর সই !

বাসন্তিকা। তার চোখে মেঘছন্দা স্বপ্নের অঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে। আর তারই ফলে ঐ, ঐ—দেখ প্রিয় বয়স্যকে সঙ্গে নিয়ে তোমার দেবী দত্ত বর এইদিক পানেই আসছেন।

মলয়াবতী। ওমা তাইতো—তিনিই যে আসছেন। কি হবে সখী, আয় আমরা এখান হতে চলে যাই—

বাসন্তিকা। বাঃ না দেখতে পেলে নিজে জ্বলা, আবার আর পাঁচ জনকে জ্বালানো—আবার দেখতে পেলেও পালানো। সেটী হচ্ছে না, তোমায় এখানেই থাকতে হবে।

মলয়াবতী। না সখি, ওঁরা এসে গেলেন। তোর দুটী পায়ে পড়ি সখি। আয় এই কুঞ্জ অন্তরালে লুকিয়ে দেখি।

(কুঞ্জমধ্যে উভয়ের প্রবেশ)

(অপরদিক হইতে জীমূতবাহন ও আত্রেয়ের প্রবেশ)

আত্রেয়। ব্যাপারখানা কি খুলে বলতো সখা ? গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা ফেলে তুমি এখানে এলে কেন ?

জীমূতবাহন। শোন সখা, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। ঐ চন্দ্রকান্ত মণি শিলাতলে আমার প্রিয়তমা, যেন অভিমান করে বসে আছেন। দু'টী চারুগণ্ডে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। আমি কেন এখনো তাকে ভুলে আছি, কেন তাঁকে এখনো গ্রহণ করিনি—এই বলে তিনি যেন আমায় তিরস্কার করছেন। স্বপ্ন দেখে স্থির থাকতে পারলুম না তাই ছুটে এলুম এই চন্দ্রমণি শিলাতলে।

আত্রেয়। হুঁ—স্বপ্নটা তাহলে তো বড়ই গুরুতর।

মলয়াবতী। কাকে স্বপ্নে দেখে উনি ছুটে এসেছেন সই! সে সে ভাগ্যবতী—

বাসন্তিকা। আর কাকে দেখবেন। নিশ্চয়ই তোমাকে।

মলয়াবতী। না—না—এ আমার প্রত্যয় হচ্ছে না।

জীমূতবাহন। সখা, এখানে এই যে একটী পদ্মপত্র পড়ে রয়েছে। ঐ গিরি সানুদেশ হতে মনঃশিলা ধাতু নিয়ে এস, প্রিয় যখন কাছে নেই তার ছবি এঁকে মনকে তবু খানিকটা সান্ত্বনা দিই।

আত্রেয়। হাঁ—এ উত্তম কথা বলেছ! (প্রস্থান)

বাসন্তিকা। শুনলে তো, প্রিয়তমার ছবি আঁকবেন। আহা কত অনুরাগ—

(মনঃশিলা লইয়া আসিল)

আত্রেয়। এই নাও সখা, পাঁচ রকম রংয়ের মনঃশিলা ধাতু এনেছি প্রাণভরে ছবি আঁকো—

(জীমূতবাহন ছবি আঁকিতে লাগিলেন)

তিনি চোখের সামনে নেই, অথচ তার ছবি আঁকা হচ্ছে ওঃ অদ্ভুত!

জীমূতবাহন। তিনি চোখের সামনে নেই, কিন্তু আমার মানস নয়নে তো রয়েছেন। সেই মানসনেত্রে আমি তাঁকে দেখছি আর তাঁর ছবি আঁকছি।

মলয়াবতী। সই শুনলি কথা।

বাসন্তিকা। চুপ কর। দেখতো আমার মনে হচ্ছে, তোমার সহোদর সিদ্ধ যুবরাজ মিত্রাবসু, এদিকে আসছেন যেন।

মলয়বতী। হাঁ—আর্য্য মিত্রাবসুইতো! উনি কেন এখানে আসছেন?

বাসন্তিকা। নিশ্চয়ই তোমার পিতা মহারাজ বিশ্বাবসু, ওঁকে পাঠিয়েছেন।

মলয়াবতী। পিতা পাঠিয়েছেন!

বাসন্তিকা। বাঃ—কিছু জান না যেন; জীমূতবাহন বিদ্যাধর কুলের রাজচক্রবর্ত্তী। তোমার পিতা ওঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দানে ইচ্ছুক, বোধ হয় সেই প্রস্তাব নিয়েই উনি এইদিকে আসছেন।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রাবসু। বিদ্যাধর রাজচক্রবর্ত্তী জীমূতবাহন, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জীমূতবাহন। (ছবি লুকাইয়া) আপনি?

মিত্রাবসু। আমি সিদ্ধ রাজকুমার মিত্রাবসু—

জীমূতবাহন। ওঃ, আসুন—আসুন রাজকুমার।

মিত্রাবসু। আপনারই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আপনাদের আশ্রমে যাচ্ছিলুম। পথে এক তাপস মুখে শুনলাম আপনি এই লতাকুঞ্জের দিকে এসেছেন। তাই আমিও এখানে এলুম।

জীমূতবাহন। আমার নিকট আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কুমার?

মিত্রাবসু। হাঁ, মলয়াবতী নামে আমার একটি সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ভগ্নী

আছেন। তিনি সিদ্ধ রাজবংশের প্রাণস্বরূপিণী। পিতার অভিপ্রায়, আপনার হস্তে আমার সেই ভগ্নিকে সমর্পণ করেন।

জীমূতবাহন। আপনাদের মত মহান্ কুলের সঙ্গে, এরূপ সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কুমার, আমি অন্তরে আর একজনকে ভালবাসি। অন্তরকে সে দিক হতে সরিয়ে আনা তো, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মলয়াবতী। শুনলে—শুনলে সই—

বাসন্তিকা। স্থির হও। একটু স্থির হও—

মিত্রাবসু। আপনার কাছে এসে এ ভাবে প্রত্যাখাত হব, স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাবছি পিতাকে গিয়ে আমি এখন কি বলি!

আত্রেয়। আপনি এক কাজ করুন। ইনি পরাধীন। এঁর কাছে প্রার্থনা করে কি হবে? এঁর পিতা মাতা আশ্রমে রয়েছেন। তাঁদের নিকট গিয়ে বরং প্রার্থনা করুন গে।

মিত্রাবসু। এ উত্তম প্রস্তাব। তাহলে আসি কুমার।

(মিত্রাবসুর প্রস্থান)

জীমূতবাহন। তুমি এ কি করলে সখা, যুবরাজ মিত্রাবসুকে পিতার নিকট যেতে বললে কেন?

আত্রেয়। নইলে কি এত শীঘ্র এখান থেকে যেত? তোমার প্রিয়ার ধ্যানে বাধা দিত যে—

জীমূতবাহন। হাঁ—সত্য বলেছ। (চিত্র দেখিয়া) এই কুমারী, এই দেবী প্রতিমার মত কুমারী ব্যতীত—অন্য কাউকে আমি ভালবাসতে পারিনা। আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসেছে, এই আমার মানসলক্ষ্মী—।

বাসন্তিকা কি হল সই, কি হল সই—

মলয়াবতী। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—আমার মাথা ঘুরছে—হাত পা যেন হিম হয়ে আসছে।

বাসন্তিকা। তাই তো কি করি—কে আছ রক্ষা কর—আমার সখীকে রক্ষা কর—

জীমূতবাহন। একি? নারী কণ্ঠের করুণ মিনতি—কে, কে ও—খানে? একি, এ যে আমারই স্বপ্নমানসী, সুন্দরী—

মলয়াবতী। না, না আপনি আমার হাত ধরবেন না—

জীমূতবাহন। নইলে তুমি যে পড়ে যাবে। এসো এই শিলাতলে বসবে এসো।

(হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল)

আত্রেয়। বলি, হোলটা কী? এনার কি মূর্চ্ছাব্যামো আছে নাকি?

বাসন্তিকা। অবলার প্রাণ মন হরণ করে, যারা তাকে শেষে নিষ্ঠুর প্রত্যাখান করে, তাদের মুখে এই রকম বিদ্রূপ বাণী, শোভা পায় বটে।

আত্রেয়। বসন্ত কে কাকে প্রত্যাখান করলে…

বাসন্তিকা। আবার কে? আপনার এই বন্ধুটী। সিদ্ধরাজ কন্যা এই এই মলয়াবতীকে, বিবাহ করতে অসম্মত, একটু আগে, যুবরাজ মিত্রাবসুকে, এই বলে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন নি?

জীমূতবাহন। ইনিই তাহলে সিদ্ধরাজ কন্যা মলয়াবতী। আমি জানতুম না—আমি না জেনে মহা অপরাধ করেছি। সুন্দরী, তোমার সখী কি, আমার এই অজ্ঞানতাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন না?

মলয়াবতী। শোন্ সই, নিজের মুখে বলেছেন—ওঁর অন্তর অন্যের প্রতি আসক্ত, এখন আবার ক্ষমা চাইছেন…

জীমূতবাহন। বিশ্বাস কর রাজকন্যা—আমি তোমারি ধ্যানে মগ্ন—তুমি সিদ্ধরাজ কন্যা, এর পরিচয় জানতুম না বলেই—মিত্রাবসুকে ও কথা বলেছি—

মলয়াবতী। শুনলাম সখি—

আত্রেয়। ওগো, আর ঝগড়া ঝাটিতে কি হবে। এই দেখ, জীমূতবাহন কোন প্রেয়সীর ছবি এঁকেছেন— (ছবি দেখাইল)

বাসন্তিকা। ওমা এযে তোমার বই ছবি, সখী, দেখ, দেখ—

মলয়াবতী। আঁ্যা—তাইতো?

আত্রেয়। চোখ চাওয়া চার হবে আর কি হবে, এবার মালা বদল করে, বিবাহ বন্ধনে বেঁধে ফেলো। অতঃপর পেটুক ব্রাহ্মণের ভোজনপর্ব্বটা মন্দ হবে না।

বাসন্তিকা। সখি ঐ যাবলো দেখ, দেখ সখীরা সব এই দিকেই আসছে।

আত্রেয়। আঁ্যা—এযে এক ঝাঁক—

(সখীগণের প্রবেশ)

সখী। রাজকন্যা, বড় সুসংবাদ যুবরাজ মিত্রাবসু এইমাত্র ফিরে এসে বললেন, মহারাজ চক্রবর্ত্তী, জীমূতবাহনের পিতা বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। আজ শুভলগ্নে তোমাদের বিবাহ হবে।

জীমূতবাহন। পিতা অনুমতি দিয়েছেন?

সখী। হ্যাঁ, এবার আপনার আশা পূর্ণ হল।

আত্রেয়। ভাল কথাই বলেছ পাগলা ভাত খাবে? না হাত ধুয়ে বসে আছি। চল—চল—বর যে ঘোমটা নারীর পুটলীর মত গলে যাচ্ছে আপনার জায়গায় নিয়ে চল—

(সখীগণের গীত)

সুন্দর এসো চলে চন্দন বনে।
সাজাব তোমারে সুন্দরী সনে॥
ঝর্ ঝর্ ধারা জলে সিনান কর
পলাস কুসুম রাঙা বসন পর
হিয়া করে আলো প্রিয়া বাহুমালা
মধু চাঁদ চেয়ে থাকে সুনীল গগনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কুসুমাকর উদ্যান।

(সিদ্ধাঙ্গনাদের নৃত্যগীত)

চল্ সই কুঞ্জে, কুসুমের পুঞ্জে
গুঞ্জে মধুকর।
ঝর ঝর ঝর বয়ে বয়ে যায় নির্ঝর
তারি সনে মিশে আসে বন তরু মর্ম্মর।
ঝুলনে দুলিব সই বঁধুরে নিয়ে।
যৌবন মদালস মদিরা পিয়ে।
রুনু ঝুনু মঞ্জীর চল বাজিয়ে
অলকে ফুল মালা পর॥

[একান্তে সিদ্ধাঙ্গনাদের প্রস্থান। অপরদিক থেকে প্রমত্ত শেখরের প্রবেশ। তাহার এক হস্তে মিষ্টান্নপূর্ণ ভাণ্ড, অপর হস্তে কলা পাতায় কাজল।]

শেখর। ঐ যা সব চলে গেল যে, এ দলে কি আমার প্রেয়সী, নবমল্লিকা আছে। ঠিক্ ঠাওর করতে পারলুম না তো কাল রাত্ প্রথম প্রহরে, রাজকন্যা মলয়াবতীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ প্রভাতে সিদ্ধ বিদ্যাধরেরা, প্রচুর আসব পান করে, নিজ নিজ প্রিয়তমাকে নিয়ে উৎসব করতে, এই কুসুমাকর উদ্যানে এসেছে। আসব বেশ খানিকটা আমিও উদরস্থ করেছি, কিন্তু আমার সেই সর্ব্ব আসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীটিকে যে খুঁজে পাচ্ছি না। সেকি তবে আর কারু সঙ্গে প্রণয় আলাপ করছে। উঁহু সেটী আর হতে

দিচ্ছিনে বাবা। এই কলার পাতায় কাজল নিয়ে এসেছি, এবার দেখা পেলে, এই সোহাগ কাজল তার চোখে পরিয়ে সম্মোহনীবিদ্যা ছাড়ব, যাতে এই শর্ম্মা ব্যতীত, আর কোন ব্যাটা ছেলের দিকে, সে—চোখ তুলে না তাকায়। তারপর—তারপর এই মোণ্ডাগুলি তাকে খাইয়ে দেব, মুখমিষ্টি হলেই, সে আমায় মিষ্টি মিষ্টি করে ডাকবে। যাই খুঁজে দেখি কোথায় আমার নবমালিকা।

[শেখরের প্রস্থান ও অপরদিক থেকে আত্রেয়ের প্রবেশ]

আত্রেয়। যাক্—ভালয় ভালয় বিয়েটা চুকে গেল—প্রিয় সখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। শুনলুম্ আজ সকালে প্রিয় সখা নববধূকে নিয়ে এই কুসুমাকর উদ্যানে আসবেন। কিন্তু বেলাতো বেড়েই চলেছে। এখনো এলেন না কেন? আঃ মোল যা, এ আবার কি? আরে, মধুকরগুলি যে আমায় আক্রমণ করছে। হায়রে অন্ধ মধুকর—একি সুন্দরীদের পদ্ম মুখ মনে করেছ—যে মধুর লোভে বারবার জ্বালাতন করছ। ওহো, বুঝেছি, আমি জামাতার প্রিয় বয়স্য। তাই রাজকন্যার সখীরা আদর করে সন্তান আর শেখর পুষ্প আমার শিখায় বেঁধে দিয়েছে। তারই উগ্রগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকরের সমাগম। কি করা যায়, সুন্দরীদের আদরের দান, এগুলো ফেলতেও পারি না, আবার এদিকে মধুকরের জ্বালাতন ও যে সইতে পারি না। আচ্ছা এক কাজ করা যাক্, ঘোমটার মত করে, এই উত্তরীয় দিয়ে, মুখ ঢেকে এখানে বসে থাকি। মধুকর ব্যাটারা খুব জব্দ হবে।

[তথাকরণ ও শেখরের পুনঃ প্রবেশ]

শেখর। এই যে প্রিয়ে নবমালিকে, এখানে ঘোমটা টেনে বসে আছে। বুঝেছি আমায় খুঁজে পায়নি—তাই অভিমান করেছে। যাই আগে সাধাসাধি করে মান ভাঙ্গাইগে। কাজল আর মিষ্টিগুলো, এখানে রেখে যাই। নইলে মান ভাঙ্গবার আগে এগুলো দেখতে পেলে, হয়তো রাগ করে ছুঁড়েই ফেলে দেবে।

[কাজল ও মিষ্টিভাণ্ড রাখিয়া আত্রেয়ের পদতলে গমন]

প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী—ভক্তের অপরাধ ক্ষমা কর। ক্ষেমঙ্করী উগ্রচণ্ডীকে—

আত্রেয়। কি সর্ব্বনাশ, এ আবার কি, মাথার ওপর মধুকর, পায়ের নীচে মাতাল। এখন করি কি—

(পুনরায় ঘোমটা দিল)

শেখর। নীরব কেন প্রিয়ে, ভক্তাধীনকে তামিষ্ট বচন দিয়ে কিঞ্চিৎ অভয় দাও অভয়া।

আত্রেয়। ওহে একি কচ্ছ, আমি অভয়া, উগ্রচণ্ডীকে, প্রাণ প্রতিমে কিছুই নইগো—

শেখর। কি কথাই বললে সইগো, মায়াময়ী, ছলনা ছাড়, মায়াবলে চেহারাটাকে যতই আমার মত গোলগাল কর, আর গলার আওয়াজ যতই পাল্টে ফেল, সুরাদেবীর প্রসাদে আমি তোমায় ঠিক চিনে নিয়েছি। তুমি আমার প্রাণ কর্কট, রূপ-মর্কট, সুরাগন্ধে ভক্‌ভক্ প্রাণেশ্বরী নবমালিকে। ঘোমটা খোল—

(ঘোমটা খোলবার চেষ্টা আত্রেয়ের ইতঃস্তত ধাবমান)

আত্রেয়। কি বিপদে পড়লুম—একি বিপদ রে বাবা—কে আছ রক্ষা কর ··আমায় রক্ষা কর—

(নবমালিকার প্রবেশ)

নবমালিকা। একি! একি হচ্ছে শেখর—এ তুমি কি করছ—

শেখর। অ্যাঁ—প্রিয়ে নবমালিকে—তুমি! তবে—তবে—

আত্রেয়। সর্ব্বনাশ রাজকন্যার সখী, যদি আমায় চিনে ফেলে কেলেঙ্কারীর একশেষ। না—যতক্ষণ না চলে যায়, ঘোমটা দিয়েই চুপ করে থাকি।

নবমালিকা। হুঁ—তোমার চোরা বিদ্যে এইবার ধরা পড়েছে। আমার ওপর উল্টে দোষ চাপাও। আর এদিকে আমায় লুকিয়ে, দিব্যি একজনের সঙ্গে রসালাপ করছ। ধিক্ তোমাকে প্রতারক—

শেখর। না প্রিয়ে—আমি মানে, আমি তোমাকে ভেবে—

নবমালিকা। থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, আর আমার চোখে ধুলো দিতে চেয়ো না। আমি যাই, ঐ লতার ফাঁস গলায় জড়িয়ে, সত্যি সত্যিই একেবারে নির্জ্জলা আত্মহত্যা করিগে।

[প্রস্থান]

শেখর। অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ। প্রিয়ে শোন—শোন—প্রিয়ে, তুমি সমস্ত লতাটা দিয়েই আত্মহত্যা কোরনা, সহমরণে যাবার জন্য আমাকেও একটু দিও! [প্রস্থান]

আত্রেয়। ওঃ বাবা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। (উত্তরীয় দিয়ে হাওয়া করণ) ঐ যে সখা, নববধূ আর তার সহচরীকে নিয়ে এই দিকেই আসছেন। বাঁচা গেল।

(জীমূতবাহন, মলয়াবতী ও বাসন্তিকার প্রবেশ)

জয় হোক, জয় হোক। তোমাদের কল্যাণ হোক।

জীমূতবাহন। সখা, অনেকক্ষণ পরে আবার তোমায় দেখে বড় আনন্দ লাভ করলাম।

আত্রেয়। তোমাদের দেখা পাবার আশায়, আমি একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে, সিদ্ধ বিদ্যাধরেরা মিলে সুরা পান করছে। তাই দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। ওরা সবাই যেন আনন্দে একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

জীমূতবাহন। তুমি ঠিকই বলেছ সখা, আনন্দে আজ সবাই দিশেহারা, এস প্রিয়ে, এইখানে একটু বসি। (বসিলেন)
কিন্তু একটা কথা ভাবছি, এই কুসুমাকর উদ্যান দেখবার কৌতূহলে, তোমায় বৃথাই ক্লেশ দিলুম। তোমার এই মুখের শোভা দু'টী সুচারু ভ্রূলতা, অধর পল্লব-মসৃণ, এই তো নন্দন কানন, এর চেয়ে সুন্দর পুষ্পোদ্যান আর কি কিছু আছে?

আত্রেয়। (বাসন্তিকাকে) শুনলে, বলি ও রাজকন্যার সখী...কথাগুলো শুনলে তো, আমার সখা কি রকম রূপের বর্ণনা দিলেন। পার ও রকম বর্ণনা করতে?

বাসন্তিকা। আহা তা আর পারিনে। আমাদের প্রিয় সখার বয়স্য তুমি, তোমার ও রূপের বর্ণনা করতে, আমার মন যে আন্‌চান্‌ করছে।

আত্রেয়। করছে নাকি?

মলয়াবতী। সখী—তুই ততক্ষণ ওঁকে, ওঁর রূপের বর্ণনা শোনা, আমরা ঐ হ্রদ থেকে; গোটা কতক পদ্মফুল তুলে আনি।

(জীমূতবাহন ও মলয়াবতীর প্রস্থান)

বাসন্তিকা। এস। কি ঠাকুর, বর্ণনা শুনবে?

আত্রেয়। তা মন্দ কি। শুনি একবার।

বাসন্তিকা। তাহলে শোন ঠাকুর, বাসর জাগবার সময়, আমি দেখলুম,

ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে। আহা, সেই নাসিকা গর্জ্জনরত ঘুমন্ত মুখখানি, কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। তুমি সেই রকম করে, খানিকটা সময় চোখ বুজে থাক। আমি তোমার বর্ণনা করি।

আত্রেয়। চোখ বুঝতে হবে ?

বাসন্তিকা। হাঁ— আমার বর্ণনা শেষ না হলে, চোখ খুলো না যেন ! তাহলে কিন্তু সব পণ্ড হয়ে যাবে।

আত্রেয়। আচ্ছা বেশ—এই আমি চোখ বুজে বস্‌ছি।

[আত্রেয় চোখ বুজিয়া বসিল। বাসন্তিকা শেখরের পরিত্যক্ত কাজল দিয়া আত্রেয়ের সারামুখ গান গাহিতে গাহিতে বিচিত্র ভাবে চিহ্নিত করিয়া দিল।]

বাসন্তিকার গীত।

রূপের নাগর ওগো গুণের সাগর
চুপ চাপ্ বসে থাকো…একটু করব আদর।
ললাট ও টাক্, দুই গিয়াছে মিশি
হাসিলে ঝরিয়া পড়ে অমানিশি,
নাসিকা ডাকিলে কাঁপে সকলি দিশি,
পিলে কাঁপে ডরে আর কাঁপে পাঁজর।
চোখ নয় যেন দুটো কুমোরের চাক্
পেট নয় সুবিশাল যেন জয় ঢাক্।
থাক্ থাক্ ভ্যাবারাম, নড়া চড়া থাক
একটু করব আদর ॥

(গীত শেষে জীমূতবাহন ও মলয়াবতীর প্রবেশ)

জীমূতবাহন। একি সখা, একি হয়েছে ?

আত্রেয়। কি আবার হবে—চন্দন মাখিয়েছে। আমার বুঝি একটু সাজবার সাধ যায় না !

জীমূতবাহন। তা এই রকম করে চন্দন মাখবার সাধ!

মলয়াবতী। সখী, একখানা দর্পণ নিয়ে আয় না।

আত্রেয়। দর্পণে কি হবে?

মলয়াবতী। আমরা একা দেখে সুখ পাচ্ছিনা ঠাকুর, তোমাকেও দেখাতে পারলে মজা হোত।

আত্রেয়। তার মানে?

বাসন্তিকা। ও কিছু না। আহা, হাতের বর্ণনা করতে ভুলে গেছি; পদ্মের পাপড়ীর মত মোলায়েম তোমার একখানি হাত দেখি।

(হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে নিজের হাতের কাজল মুছিল)

আত্রেয়। একি! কালি মাখাচ্ছ যে, কালি এলো কোথা থেকে? কালি, অ্যাঁ—তবে কি—(মুখে হাত দিয়া দেখিল, মুখের কালি হাতে লাগিল) অ্যাঁ—সারা মুখে আমার কালি মাখিয়েছ! এই তোমার চন্দন! আমার মুখে কালি—

বাসন্তিকা। আহা—চটছো কেন ঠাকুর? শুধু মুখচন্দ্র কি ভাল লাগে? তাই চন্দ্রে একটু কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিয়েছি!

আত্রেয়। ঠাট্টা হচ্ছে—আমায় নিয়ে ঠাট্টা! সখা, তোমরাও হেসে, এই দুর্ব্বিনীতা রঙ্গিনীকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! জান, আমি মহা ব্রাহ্মণ! এখনি মুখাগ্নি করে সব ভস্ম করে দেব।

জীমূতবাহন। মুখাগ্নি করবে কি সখা? কার মুখাগ্নি!

আত্রেয়। কেন, আমার মুখাগ্নি।

জীমূতবাহন। সে কি?

আত্রেয়। হাঁ, মুখ দিয়ে আমি আগুন বার করব। আগুনে সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। অগ্নিদেব—জ্বল—জ্বলে ওঠো—হাঁ...

[আত্রেয় হাঁ করিল, বাসন্তিকা একটি মোণ্ডা আনিয়া মুখে পুরিয়া দিল, আত্রেয় খাইতে লাগিল।]

জীমূতবাহন। কী হল সখা?

আত্রেয়। তা ভালই হল। সুন্দরী, আমি সরোবর থেকে মুখটা ধুয়ে আসি।

বাসন্তিকা। আহা, এমন চমৎকার সেজেছ, ধুয়ে ফেলবে?

আত্রেয়। চিত্রপট না ধুয়ে ফেললে, আবার কালি দিয়ে নূতন ছবি আঁকবে কি করে? আহা—জন্মজন্ম মুখে কালি মাখাতে রাজি আছি—যদি তার ফলে গণ্ডা গণ্ডা মোণ্ডা মেলে।

বাসন্তিকা। চল ঠাকুর, আমি তোমার মুখ ধুইয়ে নিয়ে আসি।

আত্রেয়। তা এসো গো, এসো—

(উভয়ের প্রস্থান)

জীমূতবাহন। দেবি, তোমায় লাভ করে আমার জীবন ধন্য! বিশ্বজগৎকে দেখছি যেন এক রূপ-সুন্দর অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে। মনে হচ্ছে যেন আমার চারি পার্শ্বে এক নূতন স্বর্গ রচিত হয়েছে। সে স্বর্গের শোভা বুঝি, ইন্দ্রের অমরাবতীতেও নেই। দেবী মলয়াবতী—

মলয়াবতী। হাত ছাড়, সখী মেঘছন্দা এই দিকে আসছে।

(মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। সখী, যুবরাজ মিত্রাবসু—বিদ্যাধর কুমারের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

জীমূতবাহন। মিত্রাবসু! কোথায়? এসো—এসো যুবরাজ—

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

একি, তোমায় এত বিচলিত বোধ হচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

মিত্রাবসু। কুমার, আমি বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি।

জীমূতবাহন। দুঃসংবাদ—

মিত্রাবসু। হাঁ—সেই দুর্ব্বৃত্ত মতঙ্গ তোমার রাজ্য আক্রমণ করেছে।

জীমূতবাহন। মতঙ্গ!

মিত্রাবসু। হাঁ, শমন যাকে স্মরণ করে, তার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয় বটে। তুমি কোন চিন্তা কোর না কুমার, আমি আমার সেনাদলকে রণ সজ্জা করতে আদেশ দিয়েছি। শূন্যচারী বিমানে, সমস্ত গগন আচ্ছন্ন করে, আমরা এই দণ্ডে যাত্রা করছি—সেই দুরাচার মতঙ্গকে সবংশে ধ্বংস করতে।

জীমূতবাহন। না—না যুবরাজ যুদ্ধে প্রয়োজন নেই।

মিত্রাবসু। সে কি কুমার!

জীমূতবাহন। কুমার, জীবনে আমার কোন শত্রু নেই। একমাত্র ক্লেশকেই আমি শত্রু বলে মনে করি। আমার রাজ্য লাভের জন্য, মতঙ্গ কত ক্লেশ সহ্য করছে! ক্লেশরূপ শত্রু যাকে যাতনা দিচ্ছে, সে যে করুণার পাত্র। আমি আনন্দ-চিত্তে সেই হতভাগ্যকে, আমার রাজ্য ছেড়ে দেব।

মিত্রাবসু। এ সব তুমি কি বলছ রাজকুমার? মতঙ্গ হোল তোমার করুণার পাত্র! তাকে তুমি রাজ্য ছেড়ে দেবে? না— তোমার কাছে আগমন করে—আমি মহাভুল করেছি! যাই, আমার পিতার অনুমতি নিয়ে, এখনি মতঙ্গকে ধ্বংস করতে যাই। (প্রস্থান)

জীমূতবাহন। না—না, যেয়োনা মিত্রাবসু, ফেরো—ফেরো—

(প্রস্থান)

মেঘছন্দা। শুনলি, সব শুনলি সখি?

মলয়াবতী। শুনলুম, শত্রুকে উনি বলেন করুণার পাত্র; স্বেচ্ছায় তার হাতে রাজ্য তুলে দিতে চান্। এমন সর্ব্বত্যাগী দেব-হৃদয়ে আমি আশ্রয় পেয়েছি। এঁকে নিয়ে যদি জন্ম জন্মান্তর বনবাসী থাকতে হয়—তবু আমার মত ভাগ্যবতী কোন দেবী—কোন ইন্দ্রানী—

মেঘছন্দা। সখী, সত্যিই তোমার স্বামী, শুধু দেব-দুর্ল্লভ রূপের অধিকারী নন্—অন্তরেও তিনি দেবতার চেয়ে মহান্। সত্যই তুমি মহা ভাগ্যবতী—

মলয়াবতী। সই—

মেঘছন্দা। তোমার ব্রত সার্থক হয়েছে। এবার যে আমাকে বিদায় দিতে হবে।

মলয়াবতী। সে কি, তোকে বিদায় দেব ' কোথায় যাবি তুই ?

মেঘছন্দা। তার কাছে—

মলয়াবতী। ওঃ—শঙ্খচূড়—

মেঘছন্দা। হাঁ—

মলয়াবতী। তোদের প্রণয় কাহিনী আমি সবই শুনেছি। তাই তোকে ধরে রাখতেও পারি না, আবার ছেড়ে দিতেও মন যে চায় না সখি ! আর কটা দিন এখানে থেকে যা—

মেঘছন্দা। না সখি, আর থাকতে পারছি না।

মলয়াবতী। কেন সখি, এই কদিন যদি তাকে না দেখে থাকতে পারলি—আরও দুচারদিন—

মেঘছন্দা। এ কদিন বুঝি আমি তাকে দেখিনি ? না দেখে থাকতে পেরেছি ?

মলয়াবতী। পারিস নি !

মেঘছন্দা। না সখি, তোদের জানাই নি। প্রতি রাত্রে সারা রাজপ্রাসাদ যখন ঘুমে অচেতন—আমি নিঃশব্দে মায়া দেহ ধরে, প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেছি, সেই সমুদ্রতীরে, যেখানে রয়েছে নাগরাজ্যের সিন্ধু প্রতিহার—আমার প্রিয়তম সেই শঙ্খধবল শঙ্খচূড়—

মলয়াবতী। সত্যি !

মেঘছন্দা। হ্যাঁ. বেলাভূমে মুক্তা-প্রবাল বিছানো শয্যায় বসে, দুজনে দুজনার মুখপানে, অপলক তাকিয়ে থাকি, দুজনার মনের কতো না-বলা-কথা—দুজনার চোখের আলোয় নিঃশব্দে বসে পাঠ করি। সাক্ষী থাকে মাথার ওপর অনন্ত নীলাকাশ—সামনে দিগন্তব্যাপী মহাসাগর।

মলয়াবতী। তারপর সই, সেখান থেকে কখন ফিরে আসতিস্ ?

মেঘছন্দা। দিক চক্র রেখায় যখন শুক তারাটী জ্বল জ্বল করে ওঠে, তখন বুঝি, ও আসছে আমাদের বিদায়ের বার্ত্তা নিয়ে। আবার চুপি চুপি রাজপুরীতে ফিরে এসে, শূন্য শয্যায় দেহ লুটিয়ে দিই।

মলয়াবতী। সই—

মেঘছন্দা। কাল ছিল তোমার বিবাহ উৎসব। সারারাত বাসর জাগতে হয়েছে। শুধু এই একটী রাত্রি আমি তার কাছে যেতে পারিনি, তাই মনে হচ্ছে যেন কত মাস, কত বর্ষ, কত যুগ আমি তাকে দেখিনি। তার কাছে যেতে, প্রাণ আমার কি যে উতলা হয়েছে, বোঝাতে পারব না সই।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ও কি············ও কিসের আওয়াজ ?—

মলয়াবতী। শঙ্খধ্বনি হচ্ছে—

মেঘছন্দা। শঙ্খ ! হাঁ শঙ্খধ্বনি····· কিন্তু এ শঙ্খধ্বনি যে আমি জানি। এ যে তার আহ্বান

মলয়াবতী। কার ? শঙ্খচূড়ের ?

মেঘছন্দা। হাঁ, ঐ—ঐ আবার বাজে। কেন—কেন এমন করে বারবার শঙ্খধ্বনি করছে ? একি আকুল আহ্বান ! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না সই ! আমি যাই—

মলয়াবতী। কিন্তু একটি কথা—

মেঘছন্দা। কি সখি, শীঘ্র বল, আমার যে আর সময় নেই—

মলয়াবতী। আমায় শুধু একটি কথা দিয়ে যা। আমি তোকে যে বিদ্যুৎলাস্য নৃত্য শিখিয়েছি—পরম বিপদের মুহূর্ত্ত না এলে, কখনো সে নৃত্য বিদ্যা প্রয়োগ করবি না!

মেঘছন্দা। বেশ, কথা দিয়ে গেলুম, আমার প্রিয়তমকে বাঁচাতে, আমার দেশকে বাঁচাতে, আমার জাতিকে বাঁচাতে, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, সে বিদ্যার প্রয়োগ, শুধু তখনই করব। নইলে নয়—এবার বিদায়।

(প্রস্থান)

— —

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

মলয় পর্ব্বত সানুদেশ, নিম্নে সমুদ্র।

(জীমূতবাহন ও মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রাবসু। কুমার, আপনার অনুরোধে আমি মতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধায়োজন বন্ধ করলুম। আপনি মহাপ্রাণ, তাই অমন শত্রুকে ক্ষমা করলেন—আমরা কিন্তু কিছুতেই এ কাজ করতে পারতুম না।

জীমূতবাহন। যুদ্ধে কল্যাণ নাই বন্ধু,—কল্যাণ হয় মৈত্রীতে।

মিত্রাবসু। কুমার!

জীমূতবাহন। ও কথা থাক মিত্রাবসু। এই মলয় পর্ব্বতে আমরা আশ্রম রচনা করেছি। পবিত্র শিলা এখানে আসন, তৃণদল শয্যা, শীতল নির্ঝর বারি পানীয়, কন্দ মূল ভোজ্য বস্তু, আর সরল মৃগকুল নিত্য সহচর—প্রার্থনীয় যা কিছু

বস্তু সবই এখানেই রয়েছে। শুধু দুঃখ এই, এখানে কেউ প্রার্থী নেই—দুঃখ কাতর কোন জীব নেই···যার সেবা করে জীবন ধন্য করব।

মিত্রাবসু। কুমার, এই বেলা ফিরে চলুন, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের সময় হয়েছে। হয়তো এখনি সমুদ্র জল তোলপাড় করে মহাকায় জলহস্তী দল ভেসে উঠবে। গিরি কন্দরে বজ্রনাদে ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি উত্থিত হবে। ফিরে চলুন কুমার—

জীমূতবাহন। জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হলেই আমরা গিরি শিরে উঠবো। একটু এইখানে অপেক্ষা কর মিত্রাবসু। বড় চমৎকার বোধ হচ্ছে এই সিন্ধুজল ধৌত পার্ব্বত প্রদেশকে। মিত্রাবসু, দেখ—দেখ, কি সুন্দর?

মিত্রাবসু। কি?

জীমূতবাহন। ঐ যে দূরে মলয় পর্ব্বতের সানুদেশগুলি শরতের শুভ্র মেঘে আবৃত হয়ে যেন নগাধিরাজ হিমাচলের মত শোভা ধারণ করেছে।

মিত্রাবসু। কুমার, যা দেখছেন—ও মলয় পর্ব্বতের সানুদেশ নয়, ও হচ্ছে মৃত নাগকুলের স্তুপীকৃত অস্থিরাশি!

জীমূতবাহন। সে কি! ঐ পাহাড় প্রমাণ নাগের অস্থি! এত নাগের কি করে এক সঙ্গে মৃত্যু হল?

মিত্রাবসু। এক সঙ্গে মৃত্যু হয়নি—দিনের পর দিন এক একটি নাগের অস্থি জমে ঐ অস্থি স্তুপের সৃষ্টি।

জীমূতবাহন। মিত্রাবসু, আমায় বল, সব কথা খুলে বল—

মিত্রাবসু। তাহলে শুনুন কুমার। বিনতানন্দন গরুড় ডানার বাতাসে সমুদ্র জল 'তোলপাড় করে পাতালপুরী হতে

প্রত্যহ একটি করে নাগকে আহার করতেন। একটি মাত্র নাগকে তিনি আহার করতেন বটে···কিন্তু তাঁর অত্যাচারে, তাঁর ডানার আঘাতে প্রত্যহ আরও বহু নাগের প্রাণনাশ হতো। এ ভাবে চললে অচিরে নাগকুল একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় নাগরাজ বাসুকী গরুড়কে বললেন যে—

জীমূতবাহন। বললেন—বিনতানন্দন, তুমি সকলের আগে আমাকেই ভক্ষণ কর···তাই নয়?

মিত্রাবসু। না—তা নয়।

জীমূতবাহন। তবে? এ ছাড়া তিনি আর কি বলতে পারেন?

মিত্রাবসু। তিনি বললেন, বিনতানন্দন, তোমার প্রত্যহের প্রয়োজন শুধু একটি নাগ। কিন্তু তোমার আক্রমণে অনর্থক বহু নাগ প্রাণ হারাচ্ছে। তুমি এমন করে নাগ বংশকে ধ্বংস করোনা, তোমার আহারের নিমিত্ত আমি প্রতিদিন একটি করে নাগ স্বেচ্ছায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

জীমূতবাহন। ছিঃ—ছিঃ, নাগরাজ বাসুকী এই কথা বললেন! তবে তিনি নাগকুলকে রক্ষা করলেন কোথায়? বাসুকীর সহস্র মস্তক, দ্বিসহস্র জিহ্বা, তার মধ্যে একটী জিহ্বা দান করেও তিনি কি গরুড়কে বলতে পারলেন না— একটি নাগকে বাঁচাবার জন্ম আমিই সবার আগে প্রাণ দেব।

মিত্রাবসু। সে যা হোক্, পক্ষীরাজ গরুড় এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। সেই হতে প্রতিদিন বাসুকী কর্ত্তৃক এক একটি নাগ গরুড়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। গরুড় তাকে ভোজন করেন। সেই সব মৃত নাগের অস্থি ঐ হিমাচলের মত শোভা পাচ্ছে। ঐ অস্থির স্তূপ কত

বড় হচ্ছে, দিন দিন বাড়ছে, ক্রমে আরও কত উচ্চ হবে কে জানে !

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। কুমারদের জয় হোক্—

মিত্রাবসু। এস—এস সুনন্দ, কি সংবাদ ?

সুনন্দ। মহারাজ আপনাদের উভয়কেই স্মরণ করেছেন।

মিত্রাবসু। চলুন কুমার, পিতা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

জীমূতবাহন। তুমি যাও মিত্রাবসু, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

(মিত্রাবসু ও সুনন্দের প্রস্থান)

এই দেহ, এতো ক্ষণ-ভঙ্গুর। এ তো শুধু অশুচি বস্তুর আধার। এই অনিত্য দেহের জন্য লোকে কত মহাপাপ করে ! হতভাগ্য নাগকুলের অন্তিম দশা কি শোচনীয়, কি মর্ম্মান্তিক ! আমার এই নশ্বর দেহ দান করে যদি একটী নাগেরও প্রাণ রক্ষা করতে পারতুম—পাপদেহ আমার তাহলে সত্যই চির পবিত্র হোত। (নেপথ্যে ক্রন্দনধ্বনি) একি—নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি ! এই নির্জ্জন প্রদেশে কার এ করুণ বিলাপ ! একি ! এযে দেবী মলয়াবতীর সখী সেই মেঘছন্দা বলে বোধ হচ্ছে। হাঁ মেঘছন্দাই তো বটে। সঙ্গী তার এক শঙ্খধবল নাগ ! একি রহস্য ! অন্তরালে যাই—ব্যাপার কি দেখি !

(জীমূতবাহনের প্রস্থান)

(শঙ্খচুড় ও মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। তোমায়—তোমায় আজ গরুড়ের আহার্য্যরূপে আত্মবলি দিতে হবে !

শঙ্খচুড়। হাঁ—নাগরাজ বাসুকীর আদেশ।

মেঘছন্দা। না-না—এ আদেশ আমরা মানব না। আমি তোমায় ভালবাসি। সে দিন নাগরাজের সম্মুখে নৃত্যের সময়, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে, আমার সে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, তাই ঈর্ষান্বিত নাগরাজ ক্রোধান্ধ হয়ে এই ভীষণ আদেশ দিয়েছে। এ আদেশ মানা চলে না শঙ্খচূড়—কিছুতেই না।

শঙ্খচূড়। মেঘছন্দা—

মেঘছন্দা। চল—আমরা নাগরাজ্যের সীমা ছেড়ে দূরে, বহুদূরে কোথাও চলে যাই; যেখানে সহস্র ফণা বিস্তার করেও নাগরাজ আর আমাদের ধরতে পারবে না। চল শঙ্খচূড়!

শঙ্খচূড়। সে যে হয় না মেঘছন্দা—

মেঘছন্দা। হয় না?

শঙ্খচূড়। না—নাগরাজ আমাকে গরুড়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। আজ যদি আমি ভীরুর মত প্রাণ ভয়ে পলায়ন করি—ক্ষুধার্ত্ত গরুড় এসে যদি আহার্য্য না পেয়ে ফিরে যায়—সে যে তখন মহাপ্রলয় আরম্ভ করবে। নাগরাজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। গরুড়ের প্রজ্জ্বলিত রোষবহ্নিতে সমস্ত নাগকুল একসঙ্গে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। না-না তুমি ফিরে যাও মেঘছন্দা—আমায় চির বিদায় দিয়ে ফিরে যাও—

মেঘছন্দা। ফিরে যাব?

শঙ্খচূড়। ভুলে যাও আমাদের যত অতীত প্রণয় স্মৃতি—ভুলে যাও শঙ্খচূড় বলে কেউ কখনো তোমার জীবনের পথে দেখা দিয়েছিল। মনে কর, অতীত শুধু এক মিথ্যা স্বপ্ন।

মেঘছন্দা। স্বপ্ন! আমার জীবনকে করেছ তুমি স্বপ্ন—স্বপ্নই আমার জীবন। স্বপ্ন যদি মুছে ফেলি, তবে এ জীবনের খেলাও যে শেষ করে দিতে হয়! তা যদি হয়—তাহলে এস

শঙ্খচূড়, আমরা দুজনে একই সঙ্গে গরুড়ের কাছে আত্মবলি দিই—·

শঙ্খচূড়। তুমি! না মেঘছন্দা, সেতো সম্ভব নয়।

মেঘছন্দা। কেন সম্ভব নয়?

শঙ্খচূড়। মনে কর, গুরু নাগাচার্য্যের সেই প্রত্যাদেশ···যখন সময় হবে নাগকুলকে ধ্বংস হতে রক্ষা করবে তুমি। তুমি যদি আত্মবলি দাও, কে রইবে এই হতভাগ্য নাগবংশকে বাঁচাতে?

মেঘছন্দা। শঙ্খচূড়!

শঙ্খচূড়। আর কোন কথা নয় মেঘছন্দা, তুমি ফিরে যাও।

মেঘছন্দা। ফিরে যাব! কালান্তক মহাশত্রু সেই গরুড়ের উদ্দেশে তোমায় ফেলে আমি কেমন করে ফিরে যাব?

(জনৈক নাগের প্রবেশ)

নাগ। সিন্ধু প্রতিহার শঙ্খচূড়!

শঙ্খচূড়। কে—

নাগ। আমি নাগরাজ বাসুকীর দূত। রাজ আজ্ঞায় আপনার জন্য এই রক্ত বসন এনেছি। এই বস্ত্র পরিধান করে আপনাকে বধ্য শিলায় আরোহণ করতে হবে। এই রক্ত বস্ত্র লক্ষ্য করেই গরুড় বুঝতে পারবে যে আজকের বধ্য আপনি। (বস্ত্রদান)

শঙ্খচূড়। নাগরাজের উপহার শিরোধার্য্য—

নাগ। আর অধিক বিলম্ব করবেন না। গরুড়ের আগমনের সময় হয়েছে। আমি এবার যাই।

(প্রস্থান)

শঙ্খচূড়। মেঘছন্দা—

মেঘছন্দা। তোমার হাতে রক্তবসন। মনে হচ্ছে, ও বসন যেন রঞ্জিত হয়েছে আমারই হৃদয় রক্তে। ও বসন আমি তোমায় পরতে দেবনা। হায় নাগ রাজ্যের বিধাতা, এ জগতে কি কেউ নেই যে এই নির্ম্মম মৃত্যুকে রোধ করে!

(জীমূতবাহনের প্রবেশ)

জীমূতবাহন। ভয় নেই মেঘছন্দা, শঙ্খচূড়ের মৃত্যু, আমি রোধ করব।

মেঘছন্দা। একি! বিদ্যাধর কুমার জীমূতবাহন!

জীমূতবাহন। হাঁ মেঘছন্দা, অন্তরাল হতে আমি সব শুনেছি। তুমি চিন্তা কোরনা। শঙ্খচূড়কে আমি সেই বিনতানন্দনের গ্রাস হতে নিশ্চয়ই রক্ষা করবো।

মেঘছন্দা। রক্ষা করবেন রাজকুমার? আপনার জয় হোক। বিশ্ববিধাতা আপনার পরম কল্যাণ সাধন করুন। কুমার, যে উপায় করতে হয় শীঘ্র করুন। ক্ষুধার্ত্ত গরুড় হয়তো শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হবে।

জীমূতবাহন। শঙ্খচূড়, তোমার হস্তের ঐ রক্তবসন আমাকে দান কর।

শঙ্খচূড়। রক্তবসন!

জীমূতবাহন। হাঁ, ঐ রক্তবসন আমাকে দান করে, তুমি শীঘ্র মেঘছন্দাকে নিয়ে এস্থান ত্যাগ কর।

শঙ্খচূড়। আর আপনি—?

জীমূতবাহন। আমি তোমার পরিবর্ত্তে এই রক্তবসন পরে গরুড়ের কাছে আত্মবলি দেব।

উভয়ে। সে কি?—

জীমূতবাহন। হাঁ, বহুকাল পরের সেবা করতে পারিনি! পরোপকারের এমন পরম লগ্ন আমার জীবনে অযাচিতরূপে উপস্থিত হল, এ মহালগ্ন আমি কখনো হারাতে পারব না। আমার এই তুচ্ছ দেহ পরার্থে দান করব, জীবনকে ধন্য করব। এর চেয়ে মহাসুযোগ আর কি কখন আসবে! দাও দাও শঙ্খচূড়, রক্তবসন দান করে আমার জীবনকে কৃতার্থ করতে দাও।

মেঘছন্দা। মহাপ্রাণ বিদ্যাধর কুমার, আমি শঙ্খচূড়ের জীবন রক্ষা করতে চাই সত্য, কিন্তু তা বলে আমার সখী মলয়াবতীর স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অর্পণ করব···নাগিনী বলে কি এত হীন প্রবৃত্তি আমার? না-না বিদ্যাধর কুমার, আপনার জীবনের বিনিময়ে আমি চাই না—চাই না ঐ শঙ্খচূড়ের জীবন ভিক্ষা।

জীমূতবাহন। শোন মেঘছন্দা, আমার কথা শোন।

শঙ্খচূড়। কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই মহাত্মন্। আপনাকে গরুড়ের ক্ষুধাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আমি আমার শঙ্খধবল পিতৃকুলকে কলঙ্কিত করব না। এস মেঘছন্দা, সমুদ্রতীরে ঐ ভগবান দক্ষিণ গোকর্ণের মন্দির চূড়া দেখা যাচ্ছে। ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে—আমি নাগরাজের আদেশ পালনে প্রস্তুত হই।

(প্রস্থানোদ্যত)

জীমূতবাহন। শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়—

শঙ্খচূড়। কোন কথা নয় কুমার, আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন।

(মেঘছন্দা ও শঙ্খচূড়ের প্রস্থান)

জীমূতবাহন। তাইতো, এরা যে কিছুতেই আমার অনুরোধ শুনলে না। এখন কি করি! কেমন করে শঙ্খচূড়কে রক্ষা করি! গরুড়ের নিকট কেমন করে আত্মবলি দিই! বধ্য চিহ্ন রক্ত বসন না দেখলে তো, গরুড় মেঘলোক হতে বধ্যভূমে অবতীর্ণ হবে না! কোথায় পাব রক্তবসন!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। কুমার জীমূতবাহনের জয় হোক্—

জীমূতবাহন। কে আপনি?—

কঞ্চুকী। আমি মহারাজ বিশ্বাবসুর কঞ্চুকী। কুমার মিত্রাবসুর জননী আপনাকে এই রক্তবসন উপহার পাঠিয়েছেন। আজ তাঁর বিশেষ ব্রত উপলক্ষ্যে আপনি এই বসন পরিধান করবেন।

জীমূতবাহন। মহাদেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(রক্তবসন গ্রহণ ও কঞ্চুকীর প্রস্থান)

জীমূতবাহন। ঠিক উপযুক্ত সময়ে মহাদেবী আমাকে এই রক্তবস্ত্র উপহার প্রেরণ করেছেন। দেখছি তাহলে স্বয়ং বিশ্ব-দেবতার অভিপ্রায়, আমি আজ পরার্থে আত্মবলি দিয়ে ধন্য হই। ঐ মেঘগর্জ্জনের মত ধ্বনি উঠছে, আকাশে মেঘপুঞ্জ, নিম্নে সমুদ্র জল মুহু র্মুহু আন্দোলিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত খগরাজ গরুড় আসছেন আহার্য্যের সন্ধানে। যাই, রক্তবস্ত্র ধারণ করে বধ্য শিলায় উপবেশন করিগে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে বনদেবতার গীত)

মহাকাশ সম উদার হৃদয়,
সঙ্কট দুঃখ ত্রাণ।
নাগেরে বাঁচাতে ব্রত পালো তুমি,
আপনারে বলিদান।

[গীত শেষে পশ্চাত পট আলোকিত হইল। দেখা গেল, এক পার্শ্বে নাগগণের অস্থিস্তুপ, নিম্নে বধ্য শিলায় উপবিষ্ট জীমূতবাহন। আকাশ হইতে গরুড় নামিয়া জীমূতবাহনকে লইয়া উর্দ্ধে অন্তর্হিত হইল।]

(রক্তবস্ত্র পরিহিত শঙ্খচূড় ও মেঘছন্দার প্রবেশ)

শঙ্খচূড়। একি সর্ব্বনাশ! পক্ষীরাজ আমার পরিবর্ত্তে ভক্ষ্য জ্ঞানে কাকে নখাগ্রে ধারণ করে মেঘ-লোকে ধাবিত হচ্ছেন! একি! এ যে বিদ্যাধর কুমার জীমূতবাহন!

মেঘছন্দা। জীমূতবাহন! হা ভগবান, আজ আমার জন্য, সখী মলয়াবতী স্বামী হারা হলেন! এ দৃশ্য দেখবার আগে, হে ঈশ্বর, আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)

শঙ্খচূড়। মেঘছন্দা—মেঘছন্দা, মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য তো অপেক্ষা করতে পারি না! আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলে যে পক্ষীরাজ অদৃশ্য হয়ে যাবেন! আমি ধরব…যেমন করে হোক্ তাঁকে ধরব। জীমূতবাহনকে মুক্তি দিয়ে আমি আত্মবলি দেব। দাঁড়াও—দাঁড়াও গরুড়! তুমি ভুল করেছ—মহাভুল করেছ; উনি নাগ নন্—উনি বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী জীমূতবাহন—।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—আশ্রম প্রাঙ্গণ।

(জীমূতকেতু উপবিষ্ট)

জীমূতকেতু। মা মলয়াবতী, মাগো, বধূমাতা—

(কলসী কক্ষে মলয়াবতীর প্রবেশ)

মলয়াবতী। আমায় ডাকছেন বাবা ?

জীমূতকেতু। এই যে, এসেছ মা! কোথায় গিয়েছিলে ?

মলয়াবতী। স্ফটিক নির্ঝর থেকে জল আনতে।

জীমূতকেতু। স্ফটিক নির্ঝর! শুনেছি···সে যে অনেকটা দূর পথ। সেখানে কষ্ট করে না গিয়ে আমাদের আশ্রমের কাছে যে স্রোতস্বিনী রয়েছে—

মলয়াবতী। সেই সরোবরের জলই তো রোজ আনি বাবা। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে পড়ল স্ফটিক নির্ঝরের কথা। ছেলেবেলায় আমরা ঐ নির্ঝরের ধারে খেলা করতুম···ওর জল পান করতুম। কি যে মিষ্টি জল! যেমনি শীতল তেমনি সুস্বাদু। এখন হতে রোজ আপনার জন্য ঐ নির্ঝরের জলই আনব।

জীমূতকেতু। না মা—রোজ এত কষ্ট করে···

মলয়াবতী। কষ্ট! বাবার কথা শুনে হাসি পায়।

(জীমূতবাহনের মাতা দেবীর প্রবেশ)

দেবী। কিসে হাসি পায় বৌমা ?

মলয়াবতী। এই যে—শোন মা, বাবার কথা শোন। মেয়ে বুঝি মা

বাবার সেবা করে, কখন কষ্ট পায় ? কষ্ট হয়, প্রাণ ভরে সেবা করতে না পারলে। যাই, আপনার আহারের যোগাড় করিগে।

(মলয়াবতীর প্রস্থান)

দেবী। বধূমাতা আমাদের যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। রাজ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে কেমন হাসি মুখে এই বনবাস দুঃখ বরণ করে নিয়েছেন।

জীমূতকেতু। সত্যিই দেবী, বধূমাতার রূপগুণের তুলনা হয় না। এখন আমি মাঝে মাঝে কি ভাবি জান ?

দেবী। কি ?

জীমূতকেতু। যৌবনে বিষয় ভোগ করেছি, যশের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছি, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতপূজা, যাগযজ্ঞ সবই পালন করেছি। পরম শ্লাঘনীয় পুত্র আমার জীমূতবাহন, অনুরূপ বংশজাতা কল্যাণীয়া পুত্রবধূ মলয়াবতী। জীবনে আমি কৃতার্থ হয়েছি। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। দেব—।

জীমূতকেতু। কে ?

সুনন্দ। মহারাজ বিশ্বাবসুর নিকট হতে বার্ত্তা নিয়ে এসেছি।

জীমূতকেতু। বৈবাহিক মহাশয়ের কুশল ?

সুনন্দ। হাঁ, তিনি জামাতা জীমূতবাহনের সংবাদ জানবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

জীমূতকেতু। জীমূতবাহন ?

সুনন্দ। হাঁ, মহারাজ শুনেছেন অনেকক্ষণ পূর্ব্বে জীমূতবাহন

সমুদ্র তীরের জলোচ্ছ্বাস দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন। এখনও তিনি ফিরে না আসায় মহারাজ বড় চিন্তিত হয়ে আমাকে সংবাদ নিতে পাঠালেন। তিনি কি এখানে এসেছেন ?

জীমূতকেতু। না, এখানে তো আসে নি—

দেবী। কোথায় গেল—মহারাজ, কোথায় গেল তবে আমার জীমূতবাহন ?

জীমূতকেতু। চিন্তিতা হযোনা দেবী, বোধ হয় সমুদ্রতীর হতে ফেরবার পথে সে আমাদের জন্য ফলমূল আহরণ করতে গেছে।

দেবী। না—না, ফলমূল তো বধূমাতাই আহরণ করে রেখেছেন। সে তবে কেন—বধূমাতা···বধূমাতা—

(মলয়াবতীর প্রবেশ)

মলয়াবতী। কি হয়েছে মা, একি আর্য্য সুনন্দ।

দেবী। বধূমাতা, জীমূতবাহন কোথায় গেছে জান ?—

মলয়াবতী। কেন—তিনি তো আমার দাদা মিত্রাবসুর সঙ্গে—

সুনন্দ। হাঁ, গিয়েছিলেন রাজকন্যা, কুমার মিত্রাবসুর সঙ্গে সমুদ্রতীরে গিয়েছিলেন। মিত্রাবসু আগেই ফিরে এসেছেন, জামাতা বললেন তিনি পরে আসবেন। বহুক্ষণ অতীত হয়ে গেল, এখনো তিনি ফেরেন নি—তাই—

দেবী। তোমাকে সে কিছু বলে গেছে বধূমাতা ?

মলয়াবতী। না—মা। আমি তো কিছু জানি না।

দেবী। তুমিও জান না, তবে !

জীমূতকেতু। একি, আমার বাম চক্ষু এমন করে স্পন্দিত হয়ে উঠল কেন ! একি দুর্লক্ষণ, হে বিশ্বদেব দিবাকর, হে ত্রিভুবনের নেত্র স্বরূপ ভগবান সহস্র কিরণ, আমার জীমূতবাহনকে

রক্ষা কর। একি, সূর্য্য আভার মত রক্তছটা বিকীর্ণ করে দুরন্ত বায়ু চালিত তারকা জ্যোতির মত ও কি বস্তু উর্দ্ধলোক হতে নেমে আসছে?

মলয়াবতী। হাঁ তাইতো, তীরবেগে নিম্ন দিকেই নেমে আসছে!

জীমূতকেতু। এই যে, আমার পায়ের ওপর এসে পড়ল।

(মণি পতন)

কি এ! এ যে রক্তাক্ত মাংস সংলগ্ন, কার যেন মস্তক মণি!

দেবী। মস্তক মণি! দেখি দেখি—কি সর্ব্বনাশ, মহারাজ—মহারাজ—

জীমূতকেতু। কি হ'ল দেবী—কি হ'ল!

দেবী। এ মস্তক মনি আর কারো নয়, এ যে আমারই জীমূত-বাহনের। হা—ভগবান, একি করলে প্রভু,—

(মূর্চ্ছা ও মলয়াবতী কর্ত্তৃক ধারণ)

মলয়াবতী। না-না বোল না মা,—ও কথা বোল না—

জীমূতকেতু। জীমূতবাহনের মস্তক মণি! সে কেন রক্তসিক্ত হয়ে আকাশ হতে মাটিতে পড়বে। আমি বুঝতে পারছি না—আমার মাথা ঘুরছে। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখছি।—

সুনন্দ। স্থির হোন্, মহারাজ, স্থির হোন্। আমি বলছি ও মস্তক মণি কুমার জীমূতবাহনের নয়। এখন গরুড়ের আহারের সময়। আমার মনে হয় কোন নাগের মাথার মণি গরুড়ের নখে ছিন্ন হয়ে আকাশ থেকে এখানে এসে পড়েছে।

জীমূতকেতু। তাই হবে। সত্য বলেছ সুনন্দ, এ নাগের মাথার মণিই হবে।

মলয়াবতী। ওঠ মা, স্থির হও। দেখতে এক রকম হলেও ওটা নাগের মাথার মণি।

দেবী। তাই হোক ভগবান্, তাই হোক। আমার জীমূতবাহন নিরাপদে ফিরে আসুক—

জীমূতকেতু। তুমি তাহলে যাও সুনন্দ, আর বিলম্ব কোর না, দেখে এস, আমাদের জীমূতবাহন সিদ্ধ রাজপুরীতে ফিরে এল কি না!

সুনন্দ। যথা আজ্ঞা দেব।

(সুনন্দের প্রস্থান)

মলয়াবতী। আসুন বাবা, আসুন মা, ঐ আমলকী গাছের ছায়ায় বসবেন। আমি আপনাদের সেবা করি।

জীমূতকেতু। চল মা—তাই চল—

শঙ্খচূড়। (নেপথ্যে) হা—ভগবান, এ কি করলে, এর চেয়ে আমার মৃত্যু দিলে না কেন।

জীমূতকেতু। কে! কে ও আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন করছে!

মলয়াবতী। দেখুন পিতা, রক্ত বস্ত্র পরিহিত এক ধবল কান্তি পুরুষ, আর্তনাদ করতে করতে এই দিকেই ধেয়ে আসছে। দেখে যেন নাগবংশজাত বলে বোধ হচ্ছে।

জীমূতকেতু। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ মা, ও যুবক নাগবংশধরই বটে। কিন্তু ও ক্রন্দন করছে কেন? ওঃ বুঝেছি, নিশ্চয়ই ঐ নাগেরই মাথার মণি কোন পক্ষী ওর মাথা থেকে তুলে নিয়ে এইখানে ফেলে দিয়েছে। তাই মণি হারা ফণীর এই আর্ত ক্রন্দন।

মলয়াবতী। ঐ যে, সে এসে গেছে।

শঙ্খচূড়। (নেপথ্যে) হে পক্ষীরাজ, হে গরুড়, তুমি আমায় মৃত্যু দাও, এ গ্লানি, এ যাতনা, আর যে আমি সইতে পারি না।

জীমূতকেতু। কে তুমি আর্তজন, এসো, এই দিকে এস—

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচূড়। আপনারা আমায় আহ্বান করলেন কেন? শীঘ্র বলুন, আমার অবকাশ নেই—কালমাত্র বিলম্ব করলে মহা অনর্থ সাধিত হবে।

জীমূতকেতু। কি সে অনর্থ বৎস, যার জন্য তুমি এত কাতর হচ্ছ?

শঙ্খচূড়। তাহলে শুনুন ভদ্রে, জাতিতে আমি নাগ—গরুড়ের আহারের নিমিত্ত বাসুকী আমায় পাঠিয়েছিলেন। অধিক কি বলব, মৃত্তিকায় যে রক্তধারা লক্ষ্য করে আমি ছুটে চলেছি, ধূলি জালে সেই রক্ত চিহ্ন হয়তো এখনি ঢেকে যাবে, আর লক্ষ্য পথে চলতে পারবো না, তাই সংক্ষেপে বলছি—কোনো বিদ্যাধর তরুণ আমার জীবন রক্ষা করবার জন্য গরুড়ের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

জীমূতকেতু। বিদ্যাধর তরুণ! এমন পরহিত ব্রতধারী কে—কে সে? শীঘ্র বল, তার নাম কি জীমূতবাহন?

দেব। বল—বল বাছা, চুপ করে থেকো না। বল, সে কি এই অভাগীর নয়নের নিধি জীমূতবাহন।

শঙ্খচূড। একি! এঁরা কি তবে সেই মহাপ্রাণ বিদ্যাধরের জনক জননী? এ অপ্রিয় সংবাদ আমি কেমন করে এঁদের জানাবো!

জীমূতকেতু। এখানো তুমি নীরব কেন—বল, বল নাগ, আমাদের উৎকণ্ঠা দূর কর। আমাদের জীমূতবাহন কি—

শঙ্খচূড়। এই অভাগ্যকে রক্ষা করতে তিনিই নিজের দেহ অর্পণ করেছেন।

দেবী। ওঃ, ভগবান!

মলয়াবতী। মা—মাগো—!

জীমূতকেতু। বৎস জীমূতবাহন, তুমি আমাদের চরণ সেবা করবার জন্য রাজ্যসুখে জলাঞ্জলী দিয়ে বনবাসী হয়েছো, লোকান্তরে গিয়েও তাই জনক জননীকে প্রণাম করতে ভোলনি। তাই তোমার মাথার মণি অর্পণ করেছ আমারই পদতলে।

মলয়াবতী। দিন—দিন পিতা ঐ মণিটী আমায় ভিক্ষা দিন। ঐ মণি বক্ষে ধারণ করে আমি জলন্ত চিতায় আরোহণ করি।

জীমূতকেতু। আকুল হয়োনা পতিব্রতে! আগুণে ঝাঁপ দেব আমরা সবাই। যাও মা, অগ্নিহোত্র আধার হতে অগ্নি নিয়ে এস। আমরা এ ছার দেহ প্রজ্জলিত করি।

শঙ্খচূড়। তাত, আমার অনুরোধ, আমার মিনতি, আপনারা এখনি আগুণে আত্মাহুতি দেবেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দৈবলীলার কথা কিছু বলা যায় না। মহাত্মা জীমূতবাহন নাগবংশধর নন্ জানতে পেরে, নাগশত্রু গরুড়, হয়তো তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন।

দেবী। পরিত্যাগ করতে পারে? আমার জীমূতবাহন তাহলে এখনো জীবিত থাকতে পারে?

শঙ্খচূড়। পারেন বৈকি মা, কার কি নিয়তি—কে জানে? আপনারা বরং আমার সঙ্গে চলুন। আমরা সকলে মিলে রক্তধারা চিহ্নিত পথে গরুড়কে অনুসরণ করি।

দেবী। তাই চল প্রভু—তাই চল।

জীমূতকেতু। হাঁ, তাই যাব। ভগবান করুন, যেন আমাদের আশঙ্কা মিথ্যা হয়। কিন্তু সত্যই যদি সেখানে পৌছে দেখি—জীমূতবাহনের দেহ—

মলয়াবতী। সে জন্য চিন্তা কি পিতা? সে চরম পরিণামের জন্য, আমরা প্রস্তুত হয়েই যাব। আমি ভুলিনি পিতা, আমরা অগ্নিহোত্রী, আশ্রমে রক্ষিত অগ্নি ব্যতীত, অন্য অগ্নিতে আমাদের আত্মাহুতি দিতে নেই। সত্যই যদি অদৃষ্ট-দেবতা, আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে থাকেন, রক্ষিত-অগ্নি সঙ্গে নিয়ে যাব। সেই অগ্নিতেই হবে আমাদের আত্মাহুতি।

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(গিরিচূড়ায় বধ্যভূমি)

[ক্ষতবিক্ষত দেহে জীমূতবাহন শায়িত। সম্মুখে আহাররত গরুড় আসীন]

গরুড়। একি আশ্চর্য্য! আজন্ম কত নাগকে ভক্ষণ করেছি—কিন্তু এরূপতো কখনো দেখিনি। নখাগ্রে, তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে আমি এঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত করেছি—কিন্তু এঁর কোন বেদনা বোধ হওয়া দূরে থাক—ইনি প্রসন্ন বদনে সব সহ্য করছেন। উপকারী ব্যক্তির নিকট লোকে যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমি এঁর পরম শত্রুতা করলেও এঁর চোখে মুখে যেন তেমনি কৃতজ্ঞতার হাসি। একি অলৌকিক দৃশ্য! কে ইনি!

জীমূতবাহন। গরুড়, তুমি আহারে বিরত হলে কেন? এখনও তো আমার দেহে প্রচুর মাংস রয়েছে, এখনতো শিরার মুখে অনর্গল রক্ত ঝরছে। তুমি পরমানন্দে আমার মাংস আহার করো, রক্ত পান কর। হে ক্ষুধার্ত্ত পক্ষীরাজ, তুমি বিরত হয়ো না, আহার কর—তৃপ্ত হও।

গরুড়। কে তুমি মহাত্মা—? তোমার অলৌকিক ধৈর্য্য যে আমাকে স্তম্ভিত করেছে। চঞ্চুদ্বারা আমি তোমার বক্ষ-রক্ত আহরণ করেছি—যোগীজন দুর্ল্লভ তোমার এই ধৈর্য্য বলে তুমিই যে এখন আমার হৃদয়ের রক্ত আহরণ করছ। বল মহাপুরুষ—তুমি কে?

জীমূতবাহন। তুমি ক্ষুধায় কাতর। আমার পরিচয় জানবার সময় এ নয়, আগে আমার মাংস আহার করো—পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করো—তারপর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করো। আহার কর গরুড়—আহার কর।

(শঙ্খচুড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচুড়। না না গরুড়, তুমি ক্ষান্ত হও। আর সর্ব্বনাশ করো না, উনি নাগ নন্। আমিই সেই নাগ, যাকে বাসুকী তোমার ভোজনের জন্য পাঠিয়েছেন। ওঁকে ত্যাগ কর—তুমি আমায় আহার কর।

জীমূতবাহন। শঙ্খচূড়, তুমি কেন এখানে এলে? কেন আমার অভিষ্ট লাভে বাধা দিচ্ছ তুমি?

গরুড়। এ তোমরা কি বলছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। ইনি বধ্য চিহ্ন ধারণ করে বধ্য শিলায় অপেক্ষা করছিলেন। তাইতো আমি এঁকে নিয়ে এসে আহারে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। ইনি যদি নাগ নন্—তবে ইনি কে?

শঙ্খচূড়। উনি বিদ্যাধর বংশতিলক জীমূতবাহন।

গরুড়। জীমূতবাহন! সুমেরুশিখরে, মন্দর পর্ব্বতের গহ্বরে, হিমাচলের সানুদেশে, দিগন্তের কানন সীমায়, লোকালোক গিরি বিহারী বৈতালিকগণ সর্ব্বক্ষণ উচ্চকণ্ঠে যাঁর

যশোগাঁথা কীর্ত্তন করেন—ইনিই সেই প্রাতঃস্মরণীয় জীমূতবাহন : হায়-হায়, একি মহাপাপ করেছি আমি !

জীমূতবাহন। পক্ষীরাজ, তুমি বৃথা উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আমার এই শরীর অর্পণ করেছি।

গরুড়। আর মহাপাপী আমি, বিপন্নের রক্ষাকারী সেই মহাজনকে ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য ক্ষতবিক্ষত করেছি। অগ্নিতে প্রবেশ করা ব্যতীত এ মহাপাতকের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু এ বিজন প্রদেশে কোথায় পাব অগ্নি? ঐ যে একদল অগ্নিহোত্রী তাপস, তাপসী এই দিকে আসছেন। ওঁদের কাছেই অগ্নিভিক্ষা করি।

শঙ্খচূড়। কুমার, তোমার জনক জননী ও পত্নী এই দিকে আসছেন।

জীমূতবাহন। এখানে আসছেন! শঙ্খচূড়, শীঘ্র তোমার উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে আমার এই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহকে ঢেকে দাও। ওঁরা যদি আমার এ অবস্থা দেখেন তাহলে হয়তো তা সহ্য করতে পারবেন না। হয়তো শোকে অধীর হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। দাও শীঘ্র আমায় ঢেকে দাও।

(শঙ্খচূড় দেহ ঢাকিয়া দিল)

(জীমূতকেতু, দেবী ও মলয়াবতীর প্রবেশ)

দেবী। হায় বৎস জীমূতবাহন, আমাদের পরিত্যাগ করে, তুই কোথায় গেলি বৎস ?

জীমূতবাহন। ভয় নেই মাতা, ভয় নেই পিতা, আমি এই যে, এইখানে।

জীমূতকেতু। বেঁচে আছিস্! ওবে তুই তবে বেঁচে আছিস্!

জীমূতবাহন। আছি পিতা, আপনারা উভয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

জীমূতকেতু। আয়, আয় বৎস, একবার আমার বুকে আয়—বুকে আয়—

জীমূতবাহন। পিতা—

জীমূতকেতু। বিলম্ব কেন পুত্র, তাপিত হৃদয়কে একবার তোর আলিঙ্গনে শীতল করি। আয়—ওরে আয়—

[জীমূতবাহনকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে গেল, এই সময়ে উত্তরীয় আচ্ছাদন স্খলিত হইল, তাহার ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখা গেল।]

জীমূতকেতু। একি—একি পুত্র! তোমার দেহ ক্ষত বিক্ষত!

দেবী। ক্ষত—কি সর্ব্বনাশ! ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রক্তসিক্ত মাংসরাশি! ওঃ—এ কি ভয়াবহ দৃশ্য! মা হয়ে সন্তানের এই মর্ম্মান্তিক শোচনীয় মূর্ত্তি দেখতে হল! ওরে বল্, শীঘ্র বল্, কোন্ রাক্ষস তোর এ দুর্দ্দশা করেছে। আমি তাকে অভিশাপ দেব।

গরুড়। দাও, দাও মা, অভিশাপ দাও। আমিই সেই পাপাত্মা, নাগ মনে করে, যে তোমার এই মহাপ্রাণ সন্তানের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্ দেবী, তুমি আমায় অভিসম্পাৎ দাও।

দেবী। অভিসম্পাৎ! হে পক্ষীরাজ, তুমি না স্বয়ং গোলকপতি নারায়ণের বাহন? নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণের পদরজ দেহে ধারণ করে, কোন্ প্রাণে—কোন্ প্রাণে তুমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য করলে বিনতানন্দন! হাঁ, আমি তোমায় অভিসম্পাৎ দেব, হও তুমি পক্ষীরাজ, হও তুমি স্বয়ং গোলকপতির প্রিয় বাহন, তবু তুমি স্থির জেনো, সন্তান-বেদনা কাতরা জননীর অভিসম্পাৎ, কখনও ব্যর্থ হয় না। আমি তোমায় অভিশাপ দিলুম—

জীমূতবাহন। মা—মা, আত্মোৎসর্গের মহাপুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আমি স্বেচ্ছায় এ দেহ অর্পণ করেছি। গরুড়কে অভিশাপ দিয়ে, তোমার সন্তানের পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা দিওনা জননী। তোমার পায়ে পড়ি মা—তুমি পক্ষীরাজকে অভিশাপ দিও না।

দেবী। পুত্র—পুত্র আমার—

গরুড়। একি দেখছি, জীবন হন্তারক শত্রুর জন্য একি অপূর্ব্ব করুণা! হে মহাপুরুষ, অনুতাপের তুষানলে আমি যে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কৃপা করে বলুন, আমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

জীমূতবাহন। অনুতাপেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে পক্ষীরাজ। অনুতাপেই হিংসাজাত পাপের ক্ষয় হয়। তুমি জীবহিংসা ত্যাগ কর—সকল জীবকে অভয় দান কর, তাহলেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে।

গরুড়। বেশ, তাই করব। প্রতিজ্ঞা করছি, আজ হতে আমি আর কোন প্রাণীকে হত্যা করব না। নাগকুল মহানন্দে সিন্ধুজলে, অতল পাতালে বিচরণ করুক। বিনতানন্দন গরুড় আজ হতে আর নাগ-শত্রু নয়—নাগের পরমাত্মীয়।

জীমূতবাহন। আমি ধন্য, সার্থক আমার উদ্‌যাপিত মহাব্রত। কি আনন্দ—আনন্দে আমার দেহ যে থর্ থর্ করে কাঁপছে। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

দেবী। জীমূতবাহন—জীমূতবাহন—

জীমূতবাহন। মা, বাবা, আমি হাত বাড়িয়ে নিতে পারছি না, আপনারা আপনাদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় ছুইয়ে দিন। আমার ব্রত শেষ—আমার সময়ও শেষ হয়ে এল। মলয়াবতী, কেঁদ না—দেখা হবে ঐ খানে—ঐ আলোর দেশে—।

(মৃত্যু)

দেবী। পুত্র···পুত্র—

মলয়াবতী। স্বামী—প্রভু—

জীমূতকেতু। জীমূতবাহন—জীমূতবাহন! এ যে কথা কয় না! শেষ! তবে কি সব শেষ হয়ে গেল!

শঙ্খচূড়। শেষ হ'য়ে গেল? হায় বিদ্যাধর কুল তিলক! নাগবংশকে গরুড়ের রোষানল হতে মুক্তি দিয়ে, তুমি এমনি করে অকালে মৃত্যু বরণ করলে!

গরুড়। মৃত্যু বরণ করলেন! না—না-সে কিছুতেই হবে না। আমি এ মহাত্মনকে বাঁচাব—যাই, এঁর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবার উপায় করিগে।

(প্রস্থানোদ্যত)

মলয়াবতী। দাঁড়াও পক্ষীরাজ, কি করে তুমি আমার স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করবে?

গরুড়। আমি সুরপতি ইন্দ্রের নিকট এঁর জন্য অমৃত প্রার্থনা করব।

মলয়াবতী। প্রার্থনা করবে অমৃত! সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত থেকে ত্রিভুবনকে বঞ্চিত করে, শুধু মাত্র দেবগণকে অমৃতের অধিকারী করতে, নারায়ণ ছলনাময়ী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। সেই দেবভোগ্য অমৃত, তোমার কি বিশ্বাস, প্রার্থনা করলেই দেবরাজ তোমায় দান করবেন?

গরুড়। তা যদি না করেন, ত্রিভুবনে আমি প্রলয় সাধন করব। নেত্রানলে দ্বাদশ আদিত্যকে মূর্চ্ছিত করব, তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, কুবেরের গদা চূর্ণ বিচূর্ণ করব। দেবলোক ধ্বংস করে নূতন অমৃত প্রদেশের সৃষ্টি করব। যাই—আমি যাই—

মলয়াবতী। না, তোমায় যেতে হবে না, দেবতার কাছে বাহুবলে অমৃত অধিকার করতে—

গরুড়। সে কি। এই মহাপ্রাণ বিদ্যাধর কুলতিলকের পুনর্জ্জীবনের জন্য—

মলয়াবতী। পুনর্জ্জীবন! আমার স্বামী বিশ্বলোক হতে জীবহিংসা দূরীভূত করবার জন্য, আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মিনী হয়ে, আমি কি তোমায় বলতে পারি পক্ষীরাজ, যুদ্ধের দ্বারা, হিংসার দ্বারা অমৃত আহরণ করে, আমার সেই স্বামীকে পুণর্জ্জীবিত করতে? না—চাই না, এভাবে চাই না আমি আমার স্বামীর পুনর্জ্জীবন।

গরুড়। তবে—তবে কি উপায় হবে?

(মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। উপায়—উপায় করব আমি।

মলয়াবতী। এ কি—মেঘছন্দা!

মেঘছন্দা। হাঁ, সখি—এই সেই সিন্ধু প্রতিহার শঙ্খচূড়। এঁকে রক্ষা করবার জন্যই তোমার স্বামী বিশ্বলোক বন্দিত জীমূতবাহন, আত্মোৎসর্গ করেছেন। আমি যাই সখি, এঁর পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য দেবলোক হতে অমৃত আহরণ করতে।

মলয়াবতী। তুমি, তুমি অমৃত আহরণ করবে!

মেঘছন্দা। হাঁ—আমি—

মলয়াবতী। কি উপায়ে—

মেঘছন্দা। ভয় নেই সখি, হিংসার দ্বারা নয়—অমৃত আনব আমি সমস্ত দেবলোককে আনন্দিত করে—সেই দিব্য আনন্দের বিনিময়ে।

(প্রস্থান)

—তৃতীয় দৃশ্য—

স্বর্গরাজ্যে দেবসভা—ইন্দ্র ও দেবগণ আসীন।

উর্ব্বশী নৃত্য করিতেছিল। অল্প একটু নাচিয়া সে সহসা নৃত্য বন্ধ করিল]

ইন্দ্র। এ কি উর্ব্বশী, সহসা তুমি তোমার নৃত্য বন্ধ করলে কেন?

উর্ব্বশী। মার্জ্জনা করবেন দেবরাজ, আমার দেহ আজ বড় ক্লান্ত।

ইন্দ্র। ক্লান্ত! এ ক্লান্তি বোধ হয় গতরাত্রের আসব পানের ফল?

উর্ব্বশী। হয়তো হবে। দেবরাজ অসুর যুদ্ধে জয়লাভ করে স্বর্গলোক দানব মুক্ত করেছেন। তাই সমস্ত রাত্রি, দেবলোকে চলেছে মহামহোৎসব। সেই জয়ের আনন্দে অধীর হয়ে আমি কাল রাত্রে, সত্যই বেশ খানিকটা আসব পান করেছিলুম—

ইন্দ্র। কিন্তু স্বর্গলোকে কি অমৃতের এমনি অভাব ঘটেছে, যে স্বর্গের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীকে পান করতে হবে মত্ততাদায়িনী আসব?

উর্ব্বশী। অমৃতের অভাব ঘটেনি দেবরাজ, অমৃত পান করে করে অমৃতে এসেছে বিতৃষ্ণা, তাইতো আসবের স্পৃহা।

ইন্দ্র। উর্ব্বশী—

উর্ব্বশী। হাঁ, ত্রিলোকবাঞ্ছিত উর্ব্বশী আমি, সুতরাং ত্রিলোকের যে কোন ভোগ্য বস্তুতেই, আমারও আসক্তি জন্মানো বিচিত্র নয় সুরপতি।

ইন্দ্র। দেখছি আসবের প্রমত্ততা এখনো তোমার দূর হয়নি উর্ব্বশী। তাই এমনি অসম্বদ্ধ উক্তি করছ।

উর্ব্বশী। অসম্বদ্ধ উক্তি!

ইন্দ্র। যাক্ সে কথা, আজ তো তোমার নৃত্যে, আমি খুশী হতে পারলুম না উর্ব্বশী —বরং হয়েছি ক্ষুব্ধ।

উর্ব্বশী। ক্ষুব্ধ! কেন দেবরাজ! উর্ব্বশীর নৃত্য দেখে কেউ কখনও ক্ষুব্ধ হতে পারে—এ উক্তিও তো কম অসম্বদ্ধ নয়।

ইন্দ্র। উর্ব্বশী—উর্ব্বশী, দেবগণ—

(দেবগণের প্রস্থান)

মনে রেখো, কার সামনে কি কথা বলছ তুমি—

উর্ব্বশী। ঠিকই বলছি দেবরাজ—এই আসব অরুণিত চক্ষের একটী কটাক্ষ, কন্দর্প দেবতার করধৃত পুষ্পধনুকের মত এই আমার বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গ, এই রক্তিম কোমল ওষ্ঠের শুধু একটী ক্ষীণ হাসির তরঙ্গ, সমস্ত ত্রিভুবনকে যৌবন-উন্মাদনায় চঞ্চল কোরে তোলে। সেই আমি, নৃত্যছন্দে আপনাকে অভিবাদন জানালুম, আর আপনি কিনা বলছেন—

ইন্দ্র। আঃ, অসহ্য...অসহ্য...তোমার এ দম্ভ অসহ্য উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। দম্ভ নয় দেবরাজ, আর সত্যই যদি এ দম্ভ হয়, তবু ভুলে যাচ্ছেন কেন, যে বিশ্বভুবনে চির অপরাজিতা—দম্ভ তার লজ্জা নয়, অঙ্গের সজ্জা।

ইন্দ্র। সত্য বটে, ত্রিভুবনে তুমি অপরাজিতা। তাই দিনের-পর-দিন, তোমার এই ক্রমবর্দ্ধমান দম্ভ, আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে—ক্রোধান্ধ হয়ে ভাবি তোমায় স্বর্গচ্যুতা করি....

উর্ব্বশী। করেন না কেন?

ইন্দ্র। করি না, কারণ তাতে ক্ষতি আমারই। নৃত্যছন্দে তোমার স্থান পূর্ণ করবার, দ্বিতীয়া কেউ নেই। পুরুরবার

প্রেয়ে, যখন তুমি আত্মহারা হয়েছিলে—অভিশাপ দিয়ে তোমায় মর্ত্তে পাঠালুম। অভিশপ্তা তোমাকে পেয়ে, মর্ত্তলোক হল আলোকিত—স্বর্গ হল অন্ধকার। তোমাকে হারাণো চলে না—সেই তোমার গৌরব—আর আমার —আমার লজ্জা। (উর্ব্বশী হাসিয়া উঠিল)

ঐ হাসি·· ঐ হাসি যদি থামিয়ে দিতে পারতুম, যদি স্বর্গ—মর্ত্ত—পাতাল খুঁজে—একটী মুহূর্ত্তের জন্যও এমন কাউকে পেতুম যে নৃত্য বিদ্যায় তোমায় পরাজিতা করতে পারে।

উর্ব্বশী। আমার পরাজয়! (আবার হাসিল)

ইন্দ্র। জানি, কেউ নেই, এমন কেউ নেই যে পারে নৃত্যছন্দে এই দাম্ভিকা উর্ব্বশীকে পরাজিতা করতে!

(মেঘছন্দার প্রবেশ)

মেঘছন্দা। পারি, আমি পারি দেবরাজ!

ইন্দ্র। পার? কে—কে তুমি—

মেঘছন্দা। আমি নাগলোকের রাজনর্ত্তকী—মেঘছন্দা।

উর্ব্বশী। অনার্য্যা নাগিণীর দুঃসাহস!

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও উর্ব্বশী। পার—পার তুমি নৃত্যছন্দে উর্ব্বশীকে পরাজিতা করতে?

মেঘছন্দা। পারি দেবরাজ—

ইন্দ্র। দেখাও—দেখাও তবে সে নৃত্য···

উর্ব্বশী। কিন্তু দেবরাজ, প্রতিজ্ঞা করুন, যদি না পারে আমায় পরাজিতা করতে, এর শাস্তি হবে মৃত্যু।

মেঘছন্দা। তোমাকে জয় করেও আমি মৃত্যু বরণ করতে পারি উর্ব্বশী, পরাজয়ে মৃত্যু বরণ সে তো তুচ্ছ কথা।

ইন্দ্র। চমৎকার—নাচ—তুমি নাচ—

ঊর্ব্বশী। না, নৃত্য আরম্ভের পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, কোন্ বিদ্যাবলে তুমি ত্রিলোক-বিজয়িনী ঊর্ব্বশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে এসেছ? কি সে নৃত্য!

মেঘছন্দা। সে নৃত্যের নাম 'বিদ্যুৎলাস্য'।

ঊর্ব্বশী। বিদ্যুৎলাস্য—বিদ্যুৎলাস্য!

ইন্দ্র। কি ঊর্ব্বশী, তোমার সারা মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল কেন? জান—জান তুমি এই নৃত্য! পার নাচতে?

ঊর্ব্বশী। না, পারি না, তবে এ নাচের কথা শুনেছি। কিন্তু দেবরাজ, আমি বলছি, সে নাচ এ নাগিণীও নাচতে পারবে না।

মেঘছন্দা। পারি কিনা দেখতে চাও ঊর্ব্বশী? তবে দেখ—

ঊর্ব্বশী। দাঁড়াও। জান তুমি, এ নাচের পরিণাম কি?

মেঘছন্দা। জানি—

ঊর্ব্বশী। জান! তবু তুমি?

মেঘছন্দা। হঁ্যা, তবু আমি নাচবো।

ঊর্ব্বশী। তুমি কি উন্মাদিনী! কি তোমার উদ্দেশ্য?

মেঘছন্দা। এই নাচ দেখিয়ে যদি ঊর্ব্বশীর দম্ভ চূর্ণ করতে পারি—তাহলে দেবরাজের কাছে আমার একটি প্রার্থনা—

ইন্দ্র। কি সে প্রার্থনা, বল মেঘছন্দা!

ঊর্ব্বশী। না—এখন নয়। সত্যই যদি তুমি আমায় জয় করতে পার, সত্যই যদি বিদ্যুৎলাস্য নৃত্য দেখাতে পার, প্রার্থনা শোনাবে তখন, তার আগে নয়।

মেঘছন্দা। বেশ, নৃত্যশেষে প্রার্থনা জানাব।

ঊর্ব্বশী। অঙ্গীকার করছ?

মেঘছন্দা। করলুম অঙ্গীকার। দেবসভার রাজনর্ত্তকী, পাতালের অনার্য্যা নাগকন্যাকে এইবার নৃত্যের অনুমতি দান কর—

উর্ব্বশী। দিলুম অনুমতি। কিন্তু উদ্দেশ্য হবে তোমার বিফল—বিদ্যুৎলাস্য নৃত্য শেষ হলে তোমার পরিণাম কি ভেবে দেখ। দেবরাজের সামনে প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করবে তখন কে? কোথায় থাকবে তুমি? ভাব নাগকন্যা, বেশ করে ভেবে তারপর ইচ্ছা হয় নাচ·· আর আমি বাধা দেব না।

মেঘছন্দা। প্রার্থনা জানাতে পারব না, না? দেখ উর্ব্বশী, পারি কি-না। দেবরাজ, আমার নৃত্যের উপকরণ চাই, একটি কমল পত্র, চাই কুঙ্কুম রস।

ইন্দ্র। কমল পত্র...কুঙ্কুম রস।

[প্রতিহারিণী কমল পত্র ও কুঙ্কুম রস আনিয়া দিল। মেঘছন্দা নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের সুরুতে, নৃত্যছন্দেই সে কমল পত্রে কুঙ্কুমের রসে পত্র রচনা করিল—তাহা নৃত্যছন্দেই কবরী মধ্যে রাখিল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের ছন্দে তার সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। নৃত্য শেষে সেই বিদ্যুৎ জ্বালায় সভাতলে লুটিয়া পড়িল। উর্ব্বশী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল।]

ইন্দ্র। অপূর্ব্ব...অপূর্ব্ব! ধন্য ধন্য মেঘছন্দা—তোমার নৃত্য দেখে, আমি দেবরাজ সত্যই আজ ধন্য...!

উর্ব্বশী। কাকে অভিনন্দিত করছেন দেবরাজ! সব শেষ।

ইন্দ্র। শেষ! কি বলছ উর্ব্বশী?

উর্ব্বশী। হাঁ দেবরাজ। দাম্ভিকা উর্ব্বশীর সকল দম্ভ চূর্ণ করে, উর্ব্বশী-বিজয়িনী রাজনর্ত্তকী মৃত্যু বরণ করেছে!

ইন্দ্র। মৃত্যু বরণ করেছে?

উর্ব্বশী। বিদ্যুৎলাস্য নৃত্যের পর, নর্ত্তকী জীবনের আর নৃত্য নেই। এ নাচের শেষ হয় মৃত্যুতে।

ইন্দ্র। তবে সে কথা জেনেও কেন মেঘছন্দা এ নাচ নাচল? কি প্রার্থনা নিয়ে ও এসেছিল...আমায় নাচ দেখাতে? একি বিচিত্র রহস্য...

উর্ব্বশী। দেবরাজ, দেখুন তো কমল পত্রে ও কি লিপি অঙ্কিত করেছিল!

[মেঘছন্দার কবরী মধ্য হইতে কমল পত্র বাহির করিয়া দিল! ইন্দ্র তাহা পড়িলেন।]

ইন্দ্র। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! একি অলৌকিক আত্মত্যাগ!

উর্ব্বশী। কি দেবরাজ?

ইন্দ্র। এই কমল পত্রে কুঙ্কুম রস দিয়ে লিখেছে, ওর প্রার্থনা—নৃত্য দেখে যদি খুসী হন দেবরাজ, প্রার্থনা জানাতে তখন আর আমি থাকব না। তাই লিখে গেলুম আমার ভিক্ষা, অমৃত বর্ষণে পুনর্জ্জীবিত করুন, মৃত বিদ্যাধর কুলতিলক জীমূতবাহনকে। প্রাণ দান করুন, গরুড় কর্ত্তৃক নিহত নাগকুলকে। হে বিজয়িনী রাজনর্ত্তকী, আমি তোমার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করব! অমৃত বাহিনী, অমৃত ভৃঙ্গার নিয়ে এস...

(অমৃত বাহিনী ভৃঙ্গার আনল, সেই ভৃঙ্গারের অমৃত স্পর্শ করাইল)

দেবরাজকে আনন্দিত করতে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছিলে রাজনর্ত্তকী। দেবরাজের ইচ্ছায় এই অমৃত স্পর্শে, আবার নবজীবন লাভ কর তুমি।

(মেঘছন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল)

মেঘছন্দা। প্রণাম দেবরাজ....প্রণাম জানাই দেবী—

উর্ব্বশী। না.. না, প্রণাম প্রাপ্য আমার নয়। হে উর্ব্বশী-বিজয়িনী, আমিই প্রণাম জানাই তোমায়।

মেঘছন্দা। ও কি বলছেন দেবী, আপনি যে বিশ্বজগতের সমস্ত নর্ত্তকীর চির-বন্দনীয়া। দেবরাজ আমার প্রার্থনা ·

ইন্দ্র। প্রার্থনা তোমার নিশ্চয়ই পূরণ করব মেঘছন্দা। ঐ দেখ মেঘনিঃসৃত বারি ধারার মত অজস্র ধারায় অমৃত বর্ষণ হচ্ছে। সেই অমৃতের স্পর্শ পেয়ে নাগকুলের পুঞ্জীভূত পাহাড় প্রমাণ অস্থিরাশি, রক্তমাংসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। নবজীবন লাভে উৎফুল্ল নাগগণ, তোমার জয়গান করে, সানন্দে নাগলোকে ফিরে যাচ্ছে।

মেঘছন্দা। কিন্তু বিদ্যাধর কুলতিলক জীমূতবাহন ?

ইন্দ্র। তার জন্যে চিন্তা নেই। সেই পরহিতব্রতে দেহদানকারী মহাত্মা, সবার আগেই সঞ্জীবিত হয়েছেন। আমার ইচ্ছায় স্বয়ং গরুড়, সস্ত্রীক জীমূতবাহন ও নাগ শঙ্খচূড়কে পৃষ্ঠে বহন করে, ঐ দেখ, দেব সভাতলে নিয়ে আসছে।

জীমূতবাহন, গরুড়, শঙ্খচূড় ও মলয়াবতীর প্রবেশ।

সকলে। জয় হোক্ দেবরাজ—জয় হোক দেবরাজ—

মেঘছন্দা। সখি—সখি মলয়াবতী—

মলয়াবতী। সখি মেঘছন্দা, তোমার জন্যই আজ স্বামীকে ফিরে পেলুম! এ আনন্দ লগ্নে, তোমায় দেবার জন্য, আমি একটী উপহার এনেছি। নাও, গ্রহণ কর সখি, দেবসভাতলে, দেবরাজ সাক্ষাতে তোমার হৃদয়-দেবতাকে গ্রহণ কর! দেবরাজ, আপনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন!

[শঙ্খচূড়ের সহিত মেঘছন্দার হাত মিলাইয়া দিল।]

ইন্দ্র। হাঁ—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী এই পরহিতব্রতধারী বিদ্যাধর কুলতিলক জীমূতবাহনের যশোগাথা, সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত, যেমন লোক লোকান্তরে গীত হবে—তার সঙ্গে গীত হোক্, বন্দিতা হোক—এই মেঘছন্দা রাজনর্ত্তকী।

—যবনিকা—